জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ২৭ ॥ ১০ বর্ষ ॥ জানুয়ারী ২০০২ ॥

প্রবন্ধ

জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অবস্থান ও পার্বত্য চুক্তি - ৫
তাতিন্দ্র লাল চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা - ৭
মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র রাজনীতিতে প্রসিত চক্র - ৯
পলাশ খীসা

স্বপ্নভঙ্গ - ৩২
সুদীর্ঘ চাকমা

প্রতিবেদন - ৩৪

পাকুজ্যাছড়ি সেটেলার গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখল

শতগুণ বৃদ্ধি করে দীঘিনালায় জলেভাসা জমির রাজস্ব আদায়

কেমন আছে চুক্তি বিরোধীরা?

সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সাথে চলছে ইউপিডিএফের আন্তরিকতা বিনিময়

সাংগঠনিক সংবাদ - ৪১

এবং নিয়মিত বিভাগ

সংবাদ প্রবাহ - ৪৫

কবিতা - ৫১

মংবাথোয়াই তঞ্চঙ্গ্যা/মংনু মারমা/মংবাশৈ তঞ্চঙ্গ্যা
পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা/বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা/এ কে চাকমা শিমূল
সুভাষ বসু চাকমা/মনায়ন চাকমা

সম্পাদকীয়

চুক্তি স্বাক্ষরের চার বছর পরও ভূমি কমিশনের কাজ আরম্ভ না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছে এবং জুম্মদের নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ভূমি বেদখলের লক্ষ্যে জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ-লুটপাটসহ একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের একটি বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় বহিরাগত সেটেলাররা সংঘবদ্ধভাবে জুম্মদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে সেনা ছাউনি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের শত শত একর জমি অবৈধভাবে অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বন বিভাগ কর্তৃক তথাকথিত সংরক্ষিত বন সম্প্রসারণ ও নতুন বন সৃজনের নামে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলভূক্ত হাজার হাজার একর জমি অবৈধভাবে বেদখল করা হচ্ছে। মোট কথা নানা ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে জুম্মদের ভূমি বেদখলের চতুর্মুখী অপচেষ্টা চলছে। বিগত সংগাতকালীন সময়ে সেটেলার ও সেনা ক্যাম্প কর্তৃক বেদখলকৃত জুম্মদের জায়গা-জমি যেমন উদ্ধার হয়নি অধিকন্তু সেটেলার, সেনাবাহিনী ও বন বিভাগসহ নানা কায়েমী স্বার্থান্বেষী পক্ষ কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি নানা কৌশলে অব্যাহতভাবে বেদখল করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার দ্রুত উদ্যোগ নেয়া না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তি মোতাবেক অবিলম্বে ভূমি কমিশনের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন ধরনের গড়িমসির আশ্রয় নেয়া উচিৎ নয় বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

ইউপিডিএফ নামধারী প্রসিত-সঞ্চয় নেতৃত্বাধীন চুক্তি বিরোধী চক্র সরকারের একটি বিশেস স্বার্থান্বেষী মহলের পঞ্চম বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে এক রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। চুক্তি বাস্তবায়ন বানচাল এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংসের মানসে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ চক্রকে সরকারের একটি বিশেষ মহল যেভাবে মদত দিয়ে চলেছে তা একদিন মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে বাধ্য। সংকীর্ণ স্বার্থকে হাসিল করতে গিয়ে সরকারের সেই বিশেষ মহলের এই হীন তৎপরতা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে লব্দ অর্জনকে যেমন ব্যাহত করবে তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থিতিশীলতাসহ সমগ্র বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করবে। একটা জনগোষ্ঠীকে ষড়যন্ত্র ও বঞ্চণার মধ্যে রেখে কোন দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও গণতন্ত্র জোরদার হতে পারে না। তাই কোন ধরনের সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে সুদূর প্রসারী দূরদর্শিতা নিয়ে সরকারকে চুক্তি বিরোধী সকল হীন তৎপরতার বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

পাশাপাশি জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি তথা চুক্তি পক্ষীয় লোকজনের উপর হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ চক্রের অব্যাহত সন্ত্রাসের এই ক্রান্তি কালে আশি দশকে আপামর জুম্ম জনগণ গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিরুদ্ধে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বর্তমান সময়েও সেই বিভেদপন্থীদের উত্তরসূরী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের বিরুদ্ধে সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জনসংহতি সমিতি মুক্তিকামী আপামর জুম্ম জনগণকে পুনরায় উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ ১০০ দিন অতিবাহিত হতে চলেছে। কিন্তু এখনো বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ ঘোষণা করেনি। সরকারের এহেন কালক্ষেপণ পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত নীতিরই পরিচয় বহন করে বলে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণ ভাবতে শুরু করেছে। তাই পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি জটিলতর রূপ পরিগ্রহ না করার আগে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণ এই প্রত্যাশায় রয়েছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই বিশ্বাস রাখে।

জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অবস্থান ও পার্বত্য চুক্তি

তাতিন্দ্র লাল চাকমা

ঐতিহাসিক পশ্চাদপসারণ ঃ

জুম্ম জনগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীতে ছিল শুধুই পশ্চাদপসারণ, কখনই ছিল না অগ্রসরণ। আধুনিক ইতিহাসে খুব বেশী তথ্য পাওয়া না গেলেও লোকগাথাঁয় বিশেষত চাদিগাং ছাড়া পালা ইত্যাদি গেংখুলী উপাখ্যানে আজও জনশ্রুতি আছে জুম্মরা একসময় চাদিগাং বা চট্টগ্রামে বসবাস করেছিল। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত রাজা জান বক্স খাঁর ঐতিহাসিক আমল থেকে শুরু হয়েছিল পশ্চাদপসরণ। তারপর আরাকানে জুম্মদের উপস্থিতি ইতিহাসে তথ্যসম্ভার হিসেবে পাওয়া যায়। তারপরে তৈনখালে রাজবসতি, পরবর্তীতে শুক বিলাস রাজধানী যেখানে আজও রাজানগর রাণীরহাটের নাম মুছে যায়নি। চন্দ্রঘোনা এককালের রাজধানী পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরের ইতিহাস বেশী দূরের কথা নয়। লোকমুখে বগাবিল, ধামাই হিল, কদমপুর বুড়োবুড়িদের মুখে কিসসা কাহিনী হয়ে আজও প্রচলিত গাথা হয়ে আছে। এইসব জায়গা ছেড়ে চলে আসা কি স্বেচ্ছায় সরে আসা নাকি রাজনৈতিক পশ্চাদপসারণ?

আধুনিক প্রজন্ম পরিষ্কারভাবে জানে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময় জুম্ম জনগণ রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে চিন্ত াভাবনা করেছিল। কিন্তু যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলন সফল না হলে পরিণাম হয় পশ্চাদপসরণের। তখনকার নেতা-নেতৃত্ব শুধু পশ্চাদপসরণ করেছে তাই নয় তারা পলায়নবাদী হয়ে জন্মভূমিও ত্যাগ করেছিল। ১৯৬০ সালের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষকে বার্ম.-(মায়ানমার) ও ভারতে পলায়ন করতে হয়েছিল। কিন্তু এই পলায়নের পরিণাম একটু খোঁজ করলে দেখতে পায় যারা বার্মায় গিয়েছে তারা তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যারা পলায়ন করেছে তারা অস্তি ত্ব হারায়নি বটে কিন্তু সেখানে তারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। আসামের অরুনাচলে যারা গিয়েছে তারা ৪০ বছর পরও নাগরিকত্ব পায়নি এবং আজও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এটাই হচ্ছে জুম্ম জনগণের পশ্চাদপসরণ ও পলায়নবাদের সর্বশেষ পরিণতি। ইতিহাসের এই পরিণতি জুম্ম জনগণকে শিক্ষা দেয়-

(১) নিজের জন্মভূমিতে টিকে থাকার চেষ্টায় শ্রেয়,

(২) নিজস্ব জাতিসত্বার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শুধুই পশ্চাদপসরণ কখনও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

বিভক্তিকরণ ও বিভেদনীতি ঃ

ঐতিহাসিক কারণে বৃটিশ সরকার ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলা হতে পৃথক করে এবং কার্পাস চুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ বজায় রাখে। কিন্তু সেটাও ছিল একটা বিভক্তি যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অপর বিশ্বের সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৮৯০ সালে মৌজা পত্তন হয়। এই মৌজা প্রথাও এক ধরনের বিভক্তি। তারপরই ১৯০০ সালের প্রবর্তিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি। এই শাসনবিধির দুটো দিক ছিল- তার একটা হচ্ছে জুম্ম জনগণের স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ। অন্যটি হচ্ছে স্বাতন্ত্র্যতার নামে বহির্বিশ্বের সমাজ ও সভ্যতা থেকে বিভক্ত করে রাখা। এই বিভক্তি রেখা প্রথমে বোমাং সার্কেল ও চাকমা সার্কেলে সুবিধেমত করে আরো একটা মং সার্কেল নাম দিয়ে বিভক্ত করে শাসন করা হয়েছে।

এই বিভক্তি ১৯৮৩ সালে এসে একটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে আরো বিভক্ত করে তিনটা জেলায় ভাগ করা হয়। এই তিনটা জেলাকে ১৯৮৯ সালে নয় দফা রূপরেখার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একটা ইউনিটকে তিন খন্ডে ভাগ করার মধ্য দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্র সেখানে থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে এই বিভক্তি শুধু ভৌগোলিক নয় জাতিগতভাবেও বিভেদ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। ফলে জন্ম হয়েছে চাকমা উন্নয়ন সংসদ, মারমা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ, মুরুং কমপ্লেক্স, তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ পরিষদসহ যত জাতি তত বিভক্তি। এই সবের উদ্দেশ্য একই- সেই ভাগ করা ও শাসন করার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপ যা শুধু বিভক্তি নয় বরঞ্চ বিভেদ সৃষ্টির নতুন নতুন কলাকৌশলে পরিণত হয়েছে। কারণ যে জনগোষ্ঠী যতই বৃহত্তর হবে যত তার ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হবে ততটায় শাসন করা কঠিন হবে শাসকশ্রেণীর। এই ঐতিহাসিক বিভক্তি ও বিভেদ সৃষ্টি এটা বরাবরই শাসকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। এটা পরিচালনা করতে সহজ হয়েছে এই কারণে যে এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে যারা বরাবরই শাসন করেছে তারা কেউই এই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিল না এবং কোন জুম্ম জনগোষ্ঠীর লোকও ছিল না। আজও তাই শাসকশ্রেণী বিভেদপন্থী প্রসিত-সঞ্চয়কে দিয়ে জুম্ম জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য বিভেদনীতি কার্যকর করছে এবং প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপকে কাজে লাগাচ্ছে।

ইতিহাসের এই পরিণতি থেকে একটা উপলব্দি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামকে নানা খন্ডে বিভক্ত করে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করে বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা করার জন্যই প্রয়োজন ছিল তিনটি পৃথক শাসিত পার্বত্য জেলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ- যে আঞ্চলিক পরিষদ এই ঐক্য ও সংহতি এবং প্রশাসনিক একক ইউনিটের চরিত্র ধরে রাখার দায়িত্ব পালন কবছে এবং করবে।

আর যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চিরজীবন ধরে বহিরাগত ও অজুম্মদের দ্বারা শাসিত হয়ে জুম্ম জনগণের লাঞ্চনা-বঞ্চনা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কোনোরকম সহানুভূতি দেখানো হয়নি তাই পার্বত্য চুক্তিতে তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকেও উপজাতি (জুম্ম) করার বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। এটাও ঐতিহাসিক শিক্ষা। এটাকে অন্যভাবে চিন্তা করলে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে চাপ তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামেও পড়তে থাকবে। আর জনসংখ্যার চাপে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের এই অধিকার টিকিয়ে রাখা অদূর ভবিষ্যতে কখনও সম্ভব হবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

মঙ্গল কুমার চাকমা

শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বিগত সরকার ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার ঠিক একদিন আগে ১২ জুলাই ২০০১ তারিখে তড়িঘড়ি করে জাতীয় সংসদে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" পাশ করে যায়। এই আইন পাশ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোন আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ না করেই। ফলে এই আইনে রয়ে যায় চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক বিষয় - যা চুক্তি ও জুম্ম জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরেক প্রতারণার শিকার হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী ও স্থায়ী বাঙ্গালী জনগণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম বার্নিং ইস্যু হচ্ছে ভূমি সমস্যা। দেশের মোট ভূমির এক-দশমাংশ অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ৩ শতাংশ। তন্মধ্যে আবার প্রথম শ্রেণী আবাদী জমির ৪০ শতাংশ (৫৪ হাজার একর জমি) ১৯৬০ সালে নির্মিত কাপ্তাই হ্রদের জলে তলিয়ে যায়। এছাড়া দেশের সমতল জেলাগুলোর আবাদী জমির চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির অনুর্বরতা শক্তি অনেক অনেক গুণে কম। আবাদী জমির স্বল্পতার কারণে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে শত শত ভূমিহীন পরিবার। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে এই প্রতারণামূলক অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে চার লক্ষাধিক বহিরাগত লোক এবং তাদেরকে বসতি দেয়া হয় জুম্মদের দখলীভূক্ত জমির উপর। পাশাপাশি বহিরাগত সেটেলাররা সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে গণহত্যা, লুটতরাজ, গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস ইত্যাদি নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের জমিগুলো বেদখল করে নেয় পাইকারীভাবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই মৌলিক সমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সমাধানের লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করার বিধান করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে।

বিগত সরকার ভূমি কমিশন গঠনের জন্য কিছু লোক দেখানো উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সরকার প্রথমে ৩ জুন ১৯৯৯ সনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর সরকার ৫ এপ্রিল ২০০০ইং আরেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল করিমকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তিনি ১২ জুন ২০০০ইং কার্যভার গ্রহণের পর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় একবার ঘুরে যান। তারপর তিনিও শারিরীক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে চেয়ারম্যান নিয়োগ তথা ভূমি কমিশন গঠনের কাজ তা রয়ে যায় ঝুলন্ত অবস্থায়। ভূমি কমিশনের সচিব হিসেবে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হলেও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ও রয়ে যায় অবাস্তবায়িত। অবশেষে কাজী এবায়েদুল হক নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ দানের জন্য বিগত সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ভূমি কমিশনের অন্যতম সদস্য বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেলের চীফদ্বয়ের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধও সরকার ঝুলিয়ে রাখে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকারী ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকেই ২৯ নভেম্বর ২০০১ কাজী এবায়েদুল হককে বাদ দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমান নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকে।

ভূমি কমিশন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী কাজ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশনের একটি আইন প্রণয়ন করা। বিগত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পৌনে চার বছরের মেয়াদকালে এই আইন প্রণয়নে গড়িমসি করে থাকে নানাভাবে। অবশেষে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার একদিন আগে ১২ জুলাই ২০০১ চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সেই আইন প্রণয়ন করে যায় অত্যন্ত সঙ্গোপনে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহ থেকে কোন মতামত না নিয়েই। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুসারে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে এবং আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান রয়েছে আইনে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৪নং ধারা উল্লেখ আছে যে, "জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসির্ত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।" চুক্তির ৫নং ধারায় সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁর প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ

করে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে। "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুয়ায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন" বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রণীত আইনে চুক্তির উল্লেখিত ধারাসমূহের সাথে অনেক বিরোধাত্মক বিষয় রয়েছে - যা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জটিলতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। বিরোধাত্মক ধারার উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় আলোচনা করা যাক।

প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ২(চ) ধারাতে 'পুনর্বাসিত শরণার্থী' অর্থ বলা হয়েছে যে, '৯ই মার্চ ১৯৯৭ইং তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সাথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভূক্ত শরণার্থী'। এই বিধান দ্বারা কেবলমাত্র ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ফিরে আসা শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে। ১৯৯৪ সালে সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ১৬ দফা চুক্তির আওতায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে না। ফলে তাদের ভূমি বিরোধগুলো অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

চুক্তিতে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হলেও ভূমি কমিশন আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের জমি বিরোধসহ অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পত্তিই থেকে যাবে। আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু পাহাড়ী পরিবারের সংখ্যা এক লক্ষাধিক। তাদের অধিকাংশের জমি সেটেলারদের বেদখলে। তাদের জমিগুলো যদি ফেরৎ না পায় কিংবা ভূমি বিরোধগুলো যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম হয়ে পড়বে অন্তসারশূণ্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা থেকে যাবে একই তিমিরে।

চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' এর বিরোধগুলোর ক্ষেত্রেও কমিশন নিষ্পত্তি করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রনীত কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ কাপ্তাই হ্রদের শত শত পরিবারের জমি এখন সেটেলারদের দখলে। এই জমিগুলো বংশ পরম্পরায় পাহাড়ীরা চাষাবাদ করে আসছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জারীকৃত ষ্টান্ডিং অর্ডার অনুযায়ী এই জমিগুলো ভোগ দখলের অধিকার একমাত্র মূল মালিক বা কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের রয়েছে।

কমিশনরে কার্যপদ্ধদি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) ও বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদেরকে রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে অর্পণ করা হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা। ফলে কমিশনের অন্যান্য সকল সদস্যদের মতামতের বিপক্ষে চেয়ারম্যান একাই দ্বিমত পোষণ করলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই হয়ে যাবে কমিশনের সিদ্ধান্ত।

কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের ১৩(১)(২) ধারাতে চুক্তির 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে' এই ধারা সংযোজন করা হয়নি।

উল্লেখিত বিরোধাত্মক ধারাসহ ১৯ (উনিশ)টি সংশোধনী প্রস্তাব সম্বলিত সুপারিশমালা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে স্মারক নং পাচআপ/২০০১/১১৩৯ তারিখ ২৩/৮/২০০১ মূলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণলায় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আজ অবধি এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন পদপে গ্রহণ করা হয়নি। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা না করে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়াতে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। এ সমস্যা সমাধানে যতই কালক্ষেপণ করা হবে ততই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হবে। ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়তই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে। গত ১৮ মে ২০০০ইং খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালাস্থ বোয়ালখালী ও মেরুং এলাকায় বহিরাগত সেটেলারদের দ্বারা পাহাড়ী বসতি উপর হামলা ও ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহাড়ীদের উচ্ছেদ করে জমিজমা দখল করা। এ হামলায় পাহাড়ীদের ৪২টি বাড়ী ভস্মিভূত ও ১৯১টি বাড়ী লুটপাট হয়। আর এ ঘটনায় আগা গোড়ায় সেটেলারদের প্রকাশ্যভাবে সহায়তা দেয়া হয়েছে সেনা ও পুলিশ বাহিনী থেকে।

২৫ জুন ২০০১ইং রামগড়ের ঘটনাও একই কারণে সংঘটিত হয়েছিল। এ হামলায় পাহাড়ীদের ১১০টি বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয় এবং ১১৭টি বাড়ী লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। এ হামলার সময় রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্তব্যরত পুলিশবাহিনী নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের অনেক সদস্য সেটেলারদের দিয়াশলাই দিয়ে অগ্নিসংযোগে সাহায্যও করেছিল।

গত বছরের অক্টোবর মাসে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলারদের দুই শতাধিক পরিবার জয়সেন পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পের চারপাশে পাহাড়ীদের জমিতে বসতি স্থাপন করে। এ সময় একই সাথে

(৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র রাজনীতিতে প্রসিত চক্র

পলাশ খীসা

হঠাৎ সেদিন ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর একটি খবর চমকে দিল আমাদের। আমাদের কলেজ জীবনের বন্ধু রূপক আর পৃথিবীতে নেই। খুব কাছ থেকে গুলি করে গতকাল তাকে হত্যা করা হয়েছে। চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ নেতা প্রসিত বিকাশ খীসার নির্বাচনী প্রচার কাজ করতে গিয়ে তাকে জীবন দিতে হলো। সমবেদনা, সহমর্মিতা জানাই তার বাবা-মা পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের। নীতি-নৈতিকতায় আচার ব্যবহারে রূপক ছিল একজন চমৎকার মানুষ। তবে সে ছিল প্রসিতের অন্ধ ভক্ত। তাদের দু'জনের বাড়ী ছিল পাশাপাশি, খাগড়াছড়ির পূর্ব নারানখাইয়ায়। রূপক আমার কলেজ জীবনের ঘনিষ্ট বন্ধুদের একজন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে সে ছিল বিজ্ঞান বিভাগে, আমি মানবিকে। থাকতাম নিউ হোষ্টেলে। দুই বছর কাছাকাছি থেকেছি, বহু জায়গায় এক সাথে ঘুরেছি, তাদের বাড়ীতে খেয়েছি, থেকেছি নিজের বাড়ীর মতো। রাজনীতি থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছি। তার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত শুনেছি প্রসিতের প্রশংসা, বিভিন্ন সময়ে দেয়া কুবুদ্ধি বা পরামর্শ, খাগড়াছড়ি স্কুলে পড়াকালীন সময়ের নানান ঘটনার কথা। দুটো ঘটনার কথা বলি-

এক.

খাগড়াছড়িতে তৎসময়ে 'আলম সীল' নামে ফুটবল প্রতিযোগিতা চলতো। যোগ্যতা হলো স্কুলের পড়ুয়া ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা ছাত্র। নারানখাইয়া গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করতো রূপকরাও। তাদের ওস্তাদ বা পরামর্শ দাতা ছিলেন প্রসিত। কিভাবে গোল দিতে হয় তা না শিখিয়ে তিনি শিখাতেন কিভাবে ল্যাং মারতে হয়।

দুই.

তৎসময়ে বাইরে থেকে কোন বাঙালী ছেলে পাড়ার পাশ দিয়ে খাগড়াছড়ি-পানছড়ি রাস্তায় আসতে দিতে চাইতেন না প্রসিত। কিন্তু তারপরও দু'একজন মাঝে মধ্যে বেড়াতে যেতো। প্রসিতের পরামর্শে তাদেরকে মারতো রূপকেরা। বিনা কারণে তো কাউকে মারা যায় না, কোন না কোন অজুহাত সৃষ্টি করতে হয়। তাই বুদ্ধি দিতেন প্রসিত এভাবে - প্রথমে হাঁটার সময় একজন ধাক্কা মারতো, যখনি বাঙালী ছেলেটা প্রতিবাদ করবে তখনি চলতো উত্তম-মধ্যম। তাতেও কাজ না হলে বাঙালী ছেলেটাকে বলা হতো 'ঐদিন আঙারে কি কয়স'? (ঐদিন আমাকে কি বলেছ?)। তার জবাব যাই হোক না কেন তাকে মারধর করা হতো।

উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করলাম এ কারণে যে, রূপকের মৃত্যু স্বাভাবিক কোন মৃত্যু নয় এবং এটিই প্রথম মৃত্যু নয়। এর আগেও চুক্তি পক্ষে বিপক্ষে অনেকেই নিহত হয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে তার এই করুণ পরিণতি। বিভেদপন্থী প্রসিত-সঞ্চয়ের নেতৃত্বে চুক্তি বিরোধী চক্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি অনেক অনেক প্রতিভাবান, সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমিক রূপকের মতো অকালে জীবন দিলেন যা ভাবতেও খারাপ লাগে। প্রসিত-সঞ্চয় কে, কেন চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষ? কোন কারণে রাজপথে সাহসী লড়াকু সৈনিকেরা আজ দ্বিধাবিভক্ত এবং পরস্পরকে হত্যা করছে, এ বিষয়ে অনেক দিন ধরে লিখবো লিখবো করেও লেখা হয়নি। কিছুদিন আগে রাঙ্গামাটির কল্যাণপুরে আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জুম্ম জনগণের প্রিয় নেতা সন্তু লারমার বাসভবনে গিয়ে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার বিভাগের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মঙ্গল কুমার চাকমা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু লিখি। তাই মঙ্গলদার অনুরোধে এবং ব্যক্তিগত জীবনে চুক্তি বিরোধীদের অনেক কাছ থেকে দেখার সুবাদে আমার এ লেখা।

একজনের প্রচেষ্টায় একদিনে যেমনি কোন সংগঠন গড়ে উঠে না, তেমনি একটি কারণে একদিনে কোন সংগঠন বিভক্ত হয় না। সঙ্গত কারণে চুক্তির সাথে সাথে চুক্তি বিরোধীদের উৎপত্তি হয়নি। এর পেছনে অনেক ঘটনা ও দীর্ঘ প্রচেষ্টা রয়েছে তাদের। তাই আমার এই লেখা দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৮৮ সালের শুরুতেই আমি যখন মহালছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমরা স্কুলের ছাত্রদের কিছু দাবীদাওয়া নিয়ে ও প্রধান শিক্ষকের বৈষম্যমুলক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি। এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক আমাদের দাবী মেনে নেন। এর পরপরই তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছাত্র প্রজ্ঞান খীসার সাথে (বর্তমানে মুবাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান) আমাদের পরিচয় হয়। তিনি প্রায়ই আমাদের সাথে দেখা করে জুম্ম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আকৃষ্ট হতাম তার কথাবার্তায়। ভালো লাগতো, শ্রদ্ধা করতাম, এখনো করি। একদিন খবর এলো বুদ্ধ শিবিরের দুইজন ছেলে মহালছড়ি আসছে, তারা জুম্ম জাতির শত্রু, আমরা যেন রসিদ বইসহ তাদের আটকে রাখি। যথাসময়ে তারা আসলো, আমরা রসিদ বইগুলো জব্দ করে তাদেরকে প্রথম বারের মতো ছেড়ে দিলাম। কলেজে ভর্তি হয়ে বন্ধুবর রূপকের কাছ থেকে বুদ্ধ শিবির সম্পর্কে যা জানলাম তা হলো - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) কিছু পাহাড়ী ছাত্র বুদ্ধ শিবির করে। এরা ধর্ম ব্যবসায়ী, জুম্ম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিপক্ষে, আর্মীর দালাল ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে বুদ্ধ শিবির সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা ও কৌতুহল জন্মালো। সাথে সাথে দেখার, কথা বলার আগ্রহও জন্মালো। আমরা (রূপক ও আমি) সিদ্ধান্ত নিলাম যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ে ভর্তি হবো বুদ্ধ শিবির দমন করার জন্য।

অপরদিকে প্রসিত বিকাশ খীসাসহ কিছু পাহাড়ী ছাত্র জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য লড়ছেন। প্রসিতকে ধনদা হিসেবে রূপক সম্বোধন করতো। তার মুখে ধনদার এতই প্রশংসা শুনেছি যে তাকে একনজর দেখা ও কথা বলার জন্য আগ্রহ বাড়তেই থাকলো। একদিন সেই সুযোগ সৃষ্টি হলো। ধনদাসহ তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমাদের নিউ হোষ্টেলে আসলেন অল্প সময়ের জন্য। খুব সম্ভবতঃ ১৯৮৯ সালের শেষের দিকে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর একটি প্রোগ্রামে আমরা যেন অংশগ্রহণ করি সেজন্য তারা এসেছিলেন। পিসিপির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমাদের ভিক্টোরিয়া কলেজসহ কুমিল্লার ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তখন কুমিল্লার পাহাড়ী ছাত্রদের 'হিল ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন' নামে একটি সংগঠন ছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হলাম চবিতে। ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় আমি খুঁজতে থাকি বুদ্ধ শিবিরের অস্তিত্ব। এ বিষয়ে বেশ ক'জন বড় ভাইয়ের সাথেও আলাপ করি। সবাই একবাক্যে বলেন বুদ্ধ শিবির বলতে চবিতে কোন সংগঠন নেই। এটা প্রসিতের দেয়া একটি নাম। চবিতে পিসিপি গঠনের আগ পর্যন্ত উপজাতীয় ছাত্র পরিষদ নামে পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের একটি সংগঠন ছিল। সেই সংগঠন দুটো গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটিতে নেতৃত্ব দিতেন প্রসিত এবং প্রতিপক্ষ গ্রুপের নাম দিতেন বুদ্ধ শিবির। উপজাতীয় ছাত্র পরিষদে নেতৃত্ব নির্ধারণের সময় প্রতি বছর সরাসরি ভোট হতো। সেই ভোটে প্রসিত গ্রুপের বিকোশিতা খীসা (প্রসিতের বোন) ছাড়া অন্য কেউ জিততে পারতো না। আবার সেই সংগঠনের নেতৃত্ব পর্যায়ে কেউ কেউ বুদ্ধ ছাত্র সংসদের সাথে জড়িত ছিল।

পাহাড়ী ছাত্রদের বুদ্ধ ছাত্র সংসদ করার ক্ষেত্রে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃতি রঞ্জন চাকমার প্রভাব ছিল বলে জানা যায়। তার ভাষ্য মতে কিছু সংখ্যক বড়ুয়া ছেলে বুদ্ধ ছাত্র সংসদের নাম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে প্রতি বছর মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করে। সেই টাকা যাতে আত্মসাৎ করতে না পারে এবং সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্যে প্রকৃতিবাবু কিছু পাহাড়ী ছাত্রকে বুদ্ধ ছাত্র সংসদ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই সুযোগে প্রসিত প্রতিপক্ষ গ্রুপকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার জন্য এদের নাম দেন বুদ্ধ শিবির। চবিতে একমাস যেতে না যেতেই খবর পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছি। ঢাবিতে ভর্তি হতে গেলে সঞ্চয় চাকমা চবিতে পড়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলেছিলেন চবিতে নেতৃত্বে পর্যায়ে আমাদের লোক তেমন নেই। তাছাড়া প্রজ্ঞান খীসাও নাকি আমাকে চবিতে রাখতে চায় বলে তিনি জানান। সবশেষে তিনি আমার উপর ছেড়ে দিলেন। তারপরও আমি ঢাবিতে ভর্তি হলাম এবং পিসিপির সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম অধিকতর সক্রিয়ভাবে।

ভর্তি হওয়ার বছরই আমাকে পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং একই বছরে অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এরপর ঢাকা মহানগর শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক ও পরের বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। অবিভক্ত পিসিপিতে '৯৬ এর অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের নামে কিছু নীতিচ্যুত উচ্চাভিলাষী ছাত্র সংগঠন থেকে বের হয়ে যাবার পর সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। পিসিপির সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিই ২৩ মে ২০০০ সালে।

লংগদু হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২০ মে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের রশিদ হলে গঠিত হয় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)। পিসিপি গঠিত হওয়ার আগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সংগঠন ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্র পরিষদ, ঢাকায় ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, রাজশাহীতে হিল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, কুমিল্লায় হিল ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইত্যাদি। ফলে ভিন্ন পথ ও মতের সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া পিসিপিতে শুরু থেকে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে প্রসিত বিকাশ খীসাকে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে চবি থেকে প্রবল আপত্তি করা হয়। তারপরও ধীরাজ চাকমা বাবলি, বিধানদের অনুরোধে প্রথম কমিটিতে রাখা হয়েছে সদস্য হিসেবে। চবির ছাত্রদের যে অভিযোগ তা হলো প্রসিত যেখানে যাবেন সেখানে গ্রুপিং করবেন। তার চরিত্র হচ্ছে সামন্তীয়। তিনি মনে করেন তার মত কেউ বুঝে না। কাজেই তিনি যা বলবেন তাই হবে সিদ্ধান্ত। চবি ছাত্র সংগঠনকে দ্বিধাবিভক্ত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। চবি ছাত্রদের যে আশংকা ছিল তার প্রতিফলন ঘটাতে প্রসিতের বেশী সময় লাগেনি। খুব দ্রুত তৃতীয় কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভপতির পদটি দখল করে নেন গ্রুপিং-এর মাধ্যমে। গ্রুপিং-এর পাশাপাশি শান্তিবাহিনীর নামে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে বেনামী চিঠি প্রদানের মাধ্যমে প্রাণনাশের হুমকি দেন, যাতে তারা সংগঠন থেকে সরে যায় এবং প্রসিতকে সভাপতি নির্বাচন করে। ফলে যারা প্রসিতের সমসাময়িক তারা বিতর্কে না গিয়ে নীরবে বেশীর ভাগই ছাত্র সংগঠন ছেড়ে চলে যায়।

নানিয়ারচর গণহত্যা

সংগঠনের অভ্যন্তরে বড় ধরনের বিতর্ক শুরু হয় ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচর গণহত্যার পর। এর আগেও ২০ মে ১৯৯২ রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলে কিছুটা বিতর্ক ও উত্তেজনা দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রসিতের এক জঘন্য মন্তব্যকে নিয়ে। তিনি মন্তব্য করেন - 'রাঙ্গামাটির লোকেরা সবাই সুবিধাবাদী, আপোষকামী, সরকারী দালাল। অনেক ঘর পুড়ে গেছে ভাল হয়েছে। এবার বুঝুক বাঙালীরা তাদের বন্ধু নয়।' প্রসিতের এ মন্তব্য রাঙ্গামাটির সচেতন ছাত্র সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি, মেনে নিতে পারেননি অভিভাবকরাও। তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন, 'What Khagrachari thinks today, Rangamati thinks tommorrow'. '৯৩-এ নানিয়ারচর গণহত্যার পর সংগঠনের অভ্যন্তরে বড় ধরনের বিতর্ক শুরু হয় এই কারণে যে, নানিয়ারচর গণহত্যার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনেকাংশে দায়ী প্রসিত - এ কথা মনে করতো তৎসময়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ সচেতন ছাত্ররা যারা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করতাম, এখনো করি।

২৭ অক্টোবর '৯৩ নানিয়ারচর শাখার প্রথম কাউন্সিল সম্পন্ন করার জন্য তৎকালীন পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রসিত খীসার নেতৃত্বে একদল ছাত্র নেতা নানিয়ারচর যান। ২৮ অক্টোবর কাউন্সিল সম্পন্ন করে রাঙ্গামাটি আসার উদ্দেশ্যে যাত্রী ছাউনিতে চলে আসে সফরকারী টীম। আসার সাথে সাথে প্রসিত যাত্রী ছাউনির বসার জায়গায় পা রেখে উপরে বসে যায়। সেই যাত্রী ছাউনিটি দীর্ঘদিন ধরে অর্ধেক অংশ সেনাবাহিনী চেকপোষ্ট হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। চেকপোষ্টে দায়িত্বরত সেনা সদস্যরা তা মানতে পারেনি। প্রসিতকে সেখান থেকে নেমে ভালভাবে বসার জন্য বলে সেনা সদস্যরা। প্রসিত সেনা সদস্যদের কথায় নিচে না বসে বিতর্কে জড়িয়ে যায়, সাথে সাথে সফরকারী টীমের অন্যান্য সদস্যরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেনাবাহিনীর উর্ধতন এক কর্মকর্তা সেখানে এসে যায়। সফর টীমের জন্য নির্ধারিত ট্রলারের হ্যান্ডেলটি উপরে তুলে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী। অবস্থা বেগতিক দেখে নানিয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খবর দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত বেশী হয়ে গেলে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করে মিছিল সহকারে প্রসিতকে উদ্ধার

করে নিয়ে আসা হয় এবং প্রসিত রাঙ্গামাটি না গিয়ে মহালছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি চলে আসে। আসার আগে নানিয়ারচর নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়ে আসে তারা যেন যাত্রী ছাউনি সেনামুক্ত করার জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করে। পাশাপাশি সেখান থেকে ফোনে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও ঢাকায় জানানো হয় যে, প্রসিতকে নানিয়ারচরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে সেদিনই (২৮ অক্টোবর) বিকালে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। সে মিছিলে পুলিশ সেনাবহিনীর সহযোগিতায় বিনা উস্কানীতে হামলা করে। এতে বেশ কিছু পিসিপি কর্মী আহত ও গ্রেপ্তার হয়। আগের দিন আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে ২৯ অক্টোবর ডিসি অফিস ঘেরাও করা হয় এবং পরের দিন ডিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়া হয়। রাতে মাইকিং করতে গেলে পুলিশ মাইক জব্দ করে থানায় নিয়ে যায় এবং সংগঠনের দু'জন কর্মী রিপন চাকমা ও ধর্মজ্যোতি চাকমাকে আটকে রাখে এবং পরে ছেড়ে দেয়। ৩০ অক্টোবর ডিসি অফিসে অবস্থান ধর্মঘট পালনের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খেজুর বাগান মাঠ হতে মিছিল শুরু হলে পুলিশ বিনা উস্কানীতে মিছিলে হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পিসিপির কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। নানিয়ারচর ও খাগড়াছড়ি ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। প্রসিত খীসা নভেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকায় চলে গেলে নানিয়ারচর ঘটনা ও ভুল তথ্য দিয়ে ফোন করার জন্য ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন। ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচরে যাত্রী ছাউনি সেনামুক্ত করার কর্মসূচীর কথা জানালে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। তিনি অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন কেন সেই কর্মসূচী পালন করা উচিৎ।

পক্ষান্তরে যুক্তি দেয়া হয় নানিয়ারচরের যাত্রী ছাউনি সেনামুক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনামুক্ত হবে না। তাই আমাদের আন্দোলন নির্দিষ্ট কোন সেনা ছাউনির বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেনা ক্যাম্প ও সেনা শাসনের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া ২৮ অক্টোবর '৯৩ এর ঘটনা এবং নানিয়ারচর বাজারের অবস্থানগত কারণেও এই কর্মসূচী বাতিল করা উচিৎ বলে অনেকে যুক্তি প্রদান করেন। এছাড়াও ১৭ নভেম্বর বুধবার নানিয়ারচরের বাজার দিন। দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে নিরীহ মানুষ বাজারে আসবে, কোন কারণে সংঘর্ষ বাঁধলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যুক্তি দেয়ার পরও প্রসিত তার দেয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পক্ষে নয়। ১৫ নভেম্বর নানিয়ারচর থেকে ফোন করা হয় ঢাকায়। এতে জানানো হয় - নানিয়ারচেরর পরিস্থিতি থমথমে - ১৭ তারিখের কর্মসূচী পালন করলে সংঘর্ষ অনিবার্য, সেনাবাহিনী বহিরাগত বাঙালীদের প্রস্তুত রেখেছে হামলার জন্য। টিএনও ইতিমধ্যে নানিয়ারচর থেকে বাড়ীতে চলে গেছেন, ১৭ তারিখের আগে নানিয়ারচরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে তারা কর্মসূচী বাতিল করবে কিনা জানতে চান। কিন্তু প্রসিত কোন অবস্থায় বাতিল হবে না বলে জানিয়েছেন। কর্মসূচী পালিত হলো, পিসিপির মিছিলে বহিরাগত বাঙালীরা হামলা করলো। ফলে সংঘর্ষ বেধে যায়। বহিরাগত বাঙালীরা যখন পারছে না তখনই সেনাবাহিনী গুলি চালালো। সেনাবাহিনীর গুলি ও বাহিরাগত বাঙালীদের হামলায় গ্রাম থেকে আসা অনেক নিরীহ পাহাড়ী দিন-দুপুরে মারা গেল। পুড়িয়ে দেয়া হলো পাহাড়ীদের ঘরবাড়ী। দু'একদিনের মধ্যে লেইকের মধ্যে ভেসে উঠলো একের পর এক পাহাড়ী লাশ। রচিত হয়ে গেলো পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেকটি জঘন্যতম গণহত্যা। সমালোচিত হলেন প্রসিত। সংগঠনের অভ্যন্তরে সমালোচনা-পর্যালোচনা হলেও নানিয়ারচর গণহত্যার প্রতিবাদ সাংগঠনিক উপায়ে অব্যাহত রাখা হয়েছিল। নানিয়ারচর গণহত্যার প্রতিবাদে ৭ ডিসেম্বর '৯৩ ঢাকায় শোক সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়, ৯ ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-সেনা সদস্যসহ তাদের মদদপুষ্ঠ বহিরাগত বাঙালীদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের দাবীতে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীক অনশন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিজু বর্জন

১৭ মার্চ '৯৪ ঢাবির জগন্নাথ হলের চায়ের দোকানের পাশে বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিটা যেখানে রয়েছে সেখানে অনানুষ্ঠানিক এক মিটিং-এ নানিয়ারচর গণহত্যা, সেনাবাহিনী ও সরকারের অব্যাহত দমন-পীড়নের প্রতিবাদে বিজু উৎসব বর্জনের প্রস্তাব করেন প্রসিত। সেদিন অনেকে এই বিজু উৎসব বর্জনের বিপক্ষে মত দেয়, অনেকে ভেবে দেখার কথা বলে। কারণ বিজু পাহাড়ীদের এমন একটা উৎসব যা বর্জন করা সহজ নয়। '৯২ সালের ১০ এপ্রিল লোগাং গণহত্যার পর ১৩ এপ্রিল বিজু বর্জনে ছিল জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ। '৯৪-এর বিজু বর্জন নানিয়ারচর গণহত্যার প্রতিবাদে, সেটা সংঘটিত হয়েছিল প্রায় ৬ মাস আগে। ফলে বিজু বর্জন কতটুকু কার্যকরী হবে সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল। তাছাড়া '৯৩-এর শেষের দিকে হিন্দু সম্প্রদায় দুর্গা পূজা বর্জনের ডাক দিয়েছিল, কার্যতঃ দুর্গাপূজা বর্জন হয়নি। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবসমূহ বর্জন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয়। এছাড়াও বিজু উৎসবের প্রক্রিয়া শুরু হয় দু'এক মাস আগে থেকে। বিভিন্ন গ্রামে বিজু উৎসবকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। তাই সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল ১৭ মার্চের পরে বিজু বর্জনের ডাক দিলে (বিজুর ২৪/২৫ দিনের আগে) কতটুকু সফল হবে? কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে প্রসিত একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত দিলেন বিজু বর্জন হবে তবে তিন পার্বত্য জেলার নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি বিজু বর্জন করা হয় তাহলে সেটি হবে পিসিপির উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজু উৎসব আগে যেভাবে পালন করা হতো সেভাবে হবে না, সাধারণ খানাপিনা ঘোরাফিরা চলবে।

'৯১ সালে আমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছি তাদের মধ্যেকার একতা-আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল সবচাইতে বেশী। '৯২এর শেষের দিকে আমাদের ব্যাচের সবাই মিলে একটা পিকনিক আয়োজন করে। কিন্তু '৯৩-এ বিভিন্ন সমস্যার কারণে পিকনিক বা পুনর্মিলনী করা সম্ভব হয়নি। ফলে '৯৪-এর বিজুর সময় কেউ গ্রামের বাড়ীতে বা তিন পার্বত্য জেলার কোথাও না গিয়ে এক সাথে বিজুতে ঘুরবো এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল। ব্যাচের সবাইকে সংগঠিত করাসহ পরিকল্পনা গ্রহণ করার দায়িত্ব ছিল বিপ্লব চাকমা ও জীতেন চাকমার উপর। তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করে এভাবে - জনপ্রতি ১০০ টাকা করে চাঁদা দেবে সে টাকায় মাইক্রোবাস ভাড়া করা হবে। তৎসময়ে মাইক্রো ভাড়া পেট্রোল ছাড়া দৈনিক ৭০০ টাকা। ৮ এপ্রিল '৯৪ তিন সংগঠনের (পিসিপি, পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ) নামে ঢাকায় একটি লিফলেট

বিলি করা হয়। তাতে লেখা হয় - 'বিজু সর্বাত্মকভাবে বর্জন করা হবে। খানাপিনা ঘুরাফিরা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।' সমস্যায় পড়ে যায় '৯১ ব্যাচের পরিকল্পনা। কারণ ৮ তারিখের আগে তারা অনেকের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেছে এবং মাইক্রো ভাড়াও অগ্রিম দিয়েছে।

১০ এপ্রিল ৯৪ লোগাং গণহত্যা দিবস উপলক্ষে জগন্নাথ হল মাঠ গ্যালারীতে একটি আলোচনা সভা ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। স্মরণসভা শেষে বিপ্লব চাকমা ও জীতেন চাকমা তৎসময়ে পিসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদ্বয় সঞ্চয় চাকমা ও দেবাশীষ চাকমার সাথে বিস্তারিত আলাপ করে। তখন তারা বলেছিলেন যে অসুবিধা নেই, তোমরা ঘুরতে পারবে। ফলে বিজুর সময় ৯১ ব্যাচের ৩৪ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী দু'টো মাইক্রো বাসে করে ঘুরে বেড়ায়। বিজুর পর পরই শুরু হলো বিতর্ক। এক পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বলা হলো যারা বিজুতে ঘুরেছে তারা দালাল, জুম্ম জাতির শত্রু। তৎসময়ে ঢাকা মহানগর শাখার অর্থ সম্পাদক চম্পানন চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক মনোৎপল চাকমা (বর্তমানে প্রভাষক, মহালছড়ি কলেজ) এমন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে যে, উভয়ের মধ্যে মারামারি হওয়ার মতো অবস্থা। তৎসময়ে ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জলিমং মারমা, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ চাকমা এবং আমি তিনজনে চম্পানন ও মনোৎপলকে ডেকে সমাধান করে দিলাম এবং সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে বিজু খাওয়া না খাওয়া নিয়ে আর বিতর্ক বা আলোচনা করা যাবে না। কিন্তু প্রসিত আমাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হয়ে বিজু নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা আলোচনা সভা আহ্বান করার জন্য ঢাকা মহানগর শাখাকে নির্দেশ দিলেন। আমরা তাকে জানালাম যে বিজু নিয়ে ঢাকা মহানগরে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এ সময়ে যদি আলোচনা-পর্যালোচনা আহ্বান করা হয় তাহলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তারপরও তিনি আহ্বান করার পক্ষে মত দিলেন এবং যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তা তিনি সমাধান করবেন বলে জানালেন।

আমরা ৩০ এপ্রিল '৯৪ বিজু-উত্তর পর্যালোচনা সভা জগন্নাথ হলের টেনিস কক্ষে আহ্বান করলাম। সেখানে শুরু হলো বিতর্ক-সমালোচনা। আমি '৯১ ব্যাচের ও ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে (যারা বিজু খেয়েছে) বিস্তারিত আলোচনা করলাম এবং বললাম যে বিজু বর্জনের লিফলেট পাওয়ার পরও বিজু খাওয়া আমাদের ঠিক হয়নি (যদিও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনুমোদন ছিল), সেজন্যে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আমরা বিজু খেয়ে যে ভুল করেছি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি থেকে সদস্য পর্যন্ত অনেকেই সে ভুল করেছেন। কেউ যদি প্রমাণ চান তাহলে আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি। কারণ আমরা জানতাম প্রসিত নিজেও বিজু খেয়েছেন, ঘুরেছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সঞ্চয়, বর্তিকা, বাঞ্ছা, দেবাশীষসহ অনেকেই বিজু খেয়েছেন, ঘুরেছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সেদিন কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি যে তারা বিজু খায়নি, ঘুরেনি। কিন্তু ক্যাহ্লাচিং মারমা যারা বিজু খেয়েছে তাদেরকে নানা অপবাক্য প্রয়োগ করে সমালোচনা করে। তখন অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন বিজু বর্জন সংগঠনের সিদ্ধান্ত নাকি ব্যক্তি প্রসিতের? সংগঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে তবে কখন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে? এবং কখন তিন সংগঠনের বৈঠক হয়েছে? কোন সংগঠন থেকে কারা উপস্থিত ছিল? লিফলেট লেখার দায়িত্ব কে নিয়েছে? সেদিন এত প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, জেলা পরিষদ মেনে যারা স্বাক্ষর করেছে এবং যারা জেলা পরিষদে সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে তাদেরকে আমরা দালাল, সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল বলি। আর প্রসিতের বাবা অনন্ত বিহারী খীসা ৯ দফায় স্বাক্ষরকারী খাগড়াছড়ি জেলার ৩নং ব্যক্তি এবং সে সুবাদে আমীদের কাছ থেকে অনেক অনেক সুবিধা নিয়েছেন, তাকে দালাল বলি না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর সেদিন প্রসিত দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন এসব প্রশ্ন মাস্তানীসূলভ। কেন তিনি 'মাস্তানীসূলভ' বলেছেন সভা শেষে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার জবাব দেন 'মাস্তানীসূলভ' বলিনি, 'মাষ্টারীসূলভ' বলেছি। অমীমাংসিতভাবে সেদিনের আলোচনা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ছাত্র সমাজের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষে আবারও আলোচনা সভার আহ্বান করা হয় জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ীর টিভি কক্ষে। সেদিন প্রসিত বা কোন কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত থাকেনি। সেদিনও প্রচন্ড বিতর্ক হয়, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে বিজু না খাওয়ার লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাকীরা সবাই কোন না কোনভাবে খেয়েছে। সেদিন ক্যাহ্লাচিং মারমাকে অশালীন বক্তব্য রাখার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য ক্যাহ্লাচিং মারমা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল।

৪র্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

১৩-১৫ জুন '৯৪ চট্টগ্রাম ওয়াজিউল্লাহ ইনষ্টিটিউটে ৪র্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে চবি শাখার সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। চবি শাখার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকের তালিকা দেয়া হলে কেন্দ্রীয় কমিটি দু'জন পর্যবেক্ষকের নাম পরিবর্তন করে দেয় এবং প্রতিনিধি সুখেশ্বর চাকমা পল্টু, তৎকালীন চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক'কে হলে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত চবি শাখা মানতে পারেনি। তারা তাদের দেয়া তালিকা মোতাবেক প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক রাখার দাবী জানালে কেন্দ্রীয় কমিটি তা নাখোশ করে দেয়। প্রতিনিধি হিসেবে না নেয়ার কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পল্টুকে বলা হয় সে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে রাঙ্গামাটিতে বিজু উদযাপন করার জন্য যে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে তার প্রচারণার কাজে (মাইকিং) জড়িত ছিল। সে কারণে তাকে প্রতিনিধি করা যাবে না। এ খবর চবিতে ছড়িয়ে পড়লে পরের দিন ১৪ জুন সেখান থেকে ৫০/৬০ জন ছাত্র ওয়াজিউল্লাহ ইনষ্টিটিউটে এসে কেন্দ্রীয় কমিটিকে তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পল্টুকে প্রতিনিধি করার জোর দাবী জানায় এবং তা নিয়ে জনৈক কেন্দ্রীয় নেতার সাথে তুমুল বিতর্ক চলে। ফলে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সে সময় প্রসিত চক্রের পক্ষ থেকে সুক্ষ্মভাবে প্রতিনিধিদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, চবি থেকে দালাল প্রতিক্রিয়াশীল কিছু ছাত্র এসেছে যে কোন মুহূর্তে মারামারি হতে পারে। ১৪ জুনের শেষ অধিবেশনে রাত প্রায় সাড়ে ৮টায় পল্টুর লিখিত একটি আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তৎকালীন সভাপতি প্রসিত খীসা পড়ে শোনান। সে লিখেছিল চবি শাখার প্রতিনিধি হয়েও তাকে কেন কেন্দ্রীয় কমিটি কাউন্সিলে ঢুকতে দিল না তার কারণ ব্যাখ্যা করে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য যেন সুযোগ দেয়া হয়। সেই সময়ে বিভিন্ন শাখার সাংগঠনিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা চলছিল। প্রসিত বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন কিনা মতামত জানতে চাইলেন। তিনি এভাবে বলেছিলেন - 'এখন শাখাসমূহের সাংগঠনিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা চলছে এই

মুহূর্তে পল্টুর বিষয়টা আলোচনা করা যায় কিনা? তবে কেন্দ্রীয় কমিটি এই মুহূর্তে আলোচনা করার পক্ষপাতি নয়।'

তৎসময়ে সংগঠনের অবস্থা এমন ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলো বাদে অন্যান্য শাখাগুলো কেন্দ্রীয় কমিটির মতের বিপক্ষে একটা বাক্যও উচ্চারণ করতে চাইতো না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা থেকে বেশ কয়েকজন আলোচনা করার পক্ষে মত দেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তখন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে ছিলাম। কারণ দ্বিতীয় দিনের শেষ অধিবেশনে যদি বিষয়টা নিষ্পত্তি না হয় তাহলে শেষ দিন (তৃতীয় দিন) পর্যন্ত চবি শাখার একজন প্রতিনিধি কম হবে। তাই আমি বিষয়টা নিষ্পত্তি করে হয় তাকে না হয় অন্য আরেকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার পক্ষে মতামত রেখেছিলাম। যেহেতু সেই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কমিটি আলোচনার পক্ষে নয় সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় শাখাসমূহ বাদে সবাই আলোচনার বিপক্ষে। কণ্ঠভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে মত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে চবি শাখার নেতৃবৃন্দসহ ঢাকা ও রাজশাহী বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ হল থেকে বের হয়ে যায় এবং সেই সময় দরজায় একটা বড় শব্দ হয়। ঠিক তখনই হলের ভিতর থেকে প্রসিত চক্রের কিছু উচ্ছৃংখল কর্মী উত্তেজিত হয়ে 'ধর ধর' বলে চিৎকার করে উঠে এবং চেয়ার হাতে দরজার দিকে যেতে চেষ্টা করে। বেশীর ভাগ প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক নিজ আসনে বসেছিল। ফলে উচ্ছৃংখল কর্মীদের পক্ষে দরজার বাইরে গিয়ে মারামারি করা সম্ভব হয়নি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ছাত্র রাজনীতি আর করবো না। কারণ আমরা যারা প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক হয়ে হলে ছিলাম তারা সবাই বিভিন্ন শাখার নেতৃস্থানীয়। যারা 'ধর ধর' বলছে তারা সংগঠনের কোন না কোন শাখার নেতা এবং যাদেরকে ধরতে বলছে তারাও কোন না কোন শাখার নেতা। আমরা যদি নিজেরা 'ধর ধর, মার মার' করি, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কি হবে? এসব ভেবে সংগঠনের পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না কার কাছে পদত্যাগপত্র দেবো - ঢাকার মহানগর শাখার নাকি কেন্দ্রীয় কমিটির বরাবরে। সেটা জানার জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে তৎকালীন সভাপতি প্রসিত খীসার কাছে পাঠালাম। উত্তরে তিনি জানালেন আমাকে কেউ কিছু করবে না, আমি যেন হল ত্যাগ না করি। এ তথ্য পেয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে দু'টি পদত্যাগ পত্র দিয়ে সেদিন রাতে ঢাকায় চলে গেলাম। পল্টুর বিষয়টা অমীমাংসিত রেখে কাউন্সিল সমাপ্ত হয়।

সদ্য বিদায় নেয়া সভাপতি প্রসিত খীসা ও নব নির্বাচিত সভাপতি কে এস মং মারমার নেতৃত্বে কাউন্সিল শেষ হওয়ার পরপরই একটা টীম চবিতে যায়। সেখানে কর্মী সভা করার চেষ্টা করলে সফরকারী কেন্দ্রীয় টীমকে অপদস্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। কাউন্সিলের ঘটনা এবং চবিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অপদস্থ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীঘিনালার বাবুছড়ায় তৎকালীন চবি শাখার সহ সভাপতি রিপন চাকমাকে (বর্তমানে ফ্রান্সে) মারধর করা হয়। তার জের ধরে প্রসিতের অনুসারী চবি ছাত্র জ্ঞান জ্যোতি চাকমাসহ দু'জনকে মারধর করা হয় ক্যাম্পাসে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মারধর

২০ মে '৯৫ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা চলাকালীন সময়ে খাগড়াছড়ির খেজুর বাগান মাঠে চবি শাখার প্রতিনিধি (গ্রামের বাড়ী বাঘাইছড়ি) রাজীব চাকমাকে (বর্তমানে প্রভাষক, দীঘিনালা কলেজ) মারধর করে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ছাত্র দীলিপ চাকমা ও চবি ছাত্র রমেশ দেওয়ানের নেতৃত্বে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া বাঘাইছড়ি শাখার ছাত্ররা রাজীবকে মারধর করে। তাদের কাছ থেকে রাজীব চাকমাকে জামিন নেয় তৎকালীন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা। রাতে আমি আমার বড় বোনের বাসায় মধুপুরে ছিলাম। সকালে চবির ছাত্রনেতা সুগতদর্শী চাকমা (বর্তমান প্রভাষক, দীঘিনালা কলেজ) আমাকে ডাকতে যায়। সে বলল রাজীবকে বাঘাইছড়ির ছাত্ররা নিয়ে যাবে এবং নিয়ে গেলে তাকে মেরে ফেলবে। মনটা খুবই খারাপ হলো, রাজীব আমার বন্ধু। একই ব্যাচে চবিতে ভর্তি হয়েছি। মানুষ হিসেবে রাজীবকে খারাপ বলার কোন যুক্তি নেই। সুগতদর্শী কথাটা বলার সাথে সাথে আমি তৈরী হয়ে তার সাথে যাত্রা করলাম। উদ্দেশ্য যেভাবে হোক রাজীবকে নিতে না দেয়া। প্রথমে গেলাম উন্নয়ন বোর্ডের কোয়ার্টারে এমং চাকের কাছে। এমংসহ চলে গেলাম খবংপয্যায় যেখান থেকে রাজীবকে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে দেখা হয় উজ্জ্বল স্মৃতির সাথে। উজ্জ্বল স্মৃতিও বন্ধু মানুষ। তাকে জিজ্ঞেস করলাম রাজীব কোথায়? সে বলল রাজীব রাতে পালিয়ে গেছে (মনে মনে বললাম ভালো হয়েছে প্রাণে বেঁচে গেছে)। বাঘাইছড়ির ছাত্ররা নাকি উজ্জ্বলকে চোখ রাঙিয়ে চলে গেছে রাজীবকে না পেয়ে। তাকে বললাম যারা চোখ রাঙিয়ে গেল তারা কারা, আর তুমিই বা কে? বাঘাইছড়ির থানা শাখার কর্মী হয়ে যদি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদককে চোখ রাঙিয়ে যেতে পারে তাহলে তুমি কি নেতা হলে? তোমার জেলার সাধারণ সম্পাদকের পদটা চেঙ্গী নদীর ওপারে ফেলে দাও। এসব বিষয়ে তার সাথে বেশ কিছু আলোচনা করে আমরা চলে গেলাম মধুপুরে।

দীর্ঘদিন খাগড়াছড়িতে ছিলাম, ৪ জুন ঢাকায় গিয়ে শুনি পরিস্থিতি অনেক দূর চলে গেছে। এরমধ্যে ৩০ মে '৯৫ সন্ধ্যায় জাবি ছাত্র দীলিপকে রাজীবের বন্ধুরা (আমারও বন্ধু) জাবি ক্যাম্পাসে মারধর করেছে। তার মাথা ফেটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তার এক শিক্ষক সেই মুহূর্তে সেখানে না পৌছলে তার অবস্থা আরো খারাপ হতে পারতো। বন্ধুরা এত ক্ষিপ্ত হওয়ার পেছেনে কারণ হলো রাজীবের মারাত্মক আহত হওয়া। এমনভাবে রাজীবকে মারধর করা হয়েছে কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে বিছানা থেকে ধরে তুলতে নামাতে হয়েছে। শরীরের কয়েক জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে ছিল। সুস্থ হতে পারবে কি পারবে না নিশ্চয়তা ছিল না। রাজীবের সুভাগ্য বলতে হবে সে সুস্থ হয়ে এখন দীঘিনালা কলেজে অংক বিষয়ে পড়ায়।

পরে খবর নিয়ে জানা যায়, রাজীবকে মারার পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল উল্লেখযোগ্য। '৯৪ এর বিজু বর্জনের পর চবি'র ক্যাফেটোরিয়ায় বিজু-উত্তর পর্যালোচনা সভা করা হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সঞ্চয় চাকমা উপস্থিত ছিলেন। সেই পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে রাজীব বলেছিল যে, প্রকৃত দালাল ও সুবিধাবাদীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নেতাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রসিতের বাবা একজন প্রকৃত দালাল ও সুবিধাবাদী হয়েও তাকে সেভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। কারণ প্রসিতের বাবা হলেন '৮৯ সালের ৯ দফায় স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে তিন নম্বর ব্যক্তি। সেই সুবাদে তিনি আর্মীদের কাছ থেকে

অনেক সুবিধা নিয়েছেন। খাগড়াছড়ি বাজারের অনেক প্লট নিজের নামে করেছেন। তা ছাড়া আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে যেটা বিরোধিতা করি সেই চাকমা উন্নয়ন সংসদ গঠন করে এবং সভাপতির পদ গ্রহণ করে আর্মীদের দালালীপনা করেছেন। কারণ এসব সংগঠন সরকারের 'ভাগ করো শাসন করো' নীতির অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী গঠন করে দেয়।

ঘটনার পরের দিন ২১ মে রমেশ দেওয়ানের নেতৃত্বে খবংপয্যার অনিল চাকমার বাড়ীতে (যে বাড়ীতে রাজীব ছিল) তল্লাসী চালায় এবং অশোভন আচরণ করে। ঘটনার ২/৩ দিন পর রাজীবের বাবা-মার কাছ থেকে লিখিতভাবে অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, তিন দিনের মধ্যে রাজীবকে প্রসিত চক্রের হাতে হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় রাজীবের বাবার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তিনদিন পর রাজীবের বাবা বলেন যে তার পক্ষে রাজীবকে হাজির করে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ রাজীব বর্তমানে তার অবাধ্য। তখন রাজীবের বাবার কাছ অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, আমার ছেলে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কাজ করছে। কাজেই তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করলে আমার কোন আপত্তি বা দাবী দাওয়া নেই। একই মাসে তৎকালীন চবি ছাত্র বিতাংশু চাকমা (বর্তমানে প্রভাষক, দীঘিনালা কলেজ) সন্ধ্যায় মিলনপুর বেড়াতে গেলে প্রিয় সম্পদ চাকমার নেতৃত্বে ঘেরাও করা হয়। বিতাংশু চাকমা খাগড়াছড়ির স্থানীয় ছেলে হওয়ায় তিনিও পাল্টা হুমকি দেন। ফলে প্রিয় সম্পদরা ভয়ে পালিয়ে যায়। এরপর আরেকবার রাতে বিতাংশুকে বাড়ীতে ঘেরাও করে প্রসিত চক্র। সে সময়ে সে বাড়ীতে ছিল না।

এসব ঘটনার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্রদের একটা তালিকা তৈরী করে প্রসিত চক্র। প্রত্যেকটি থানা শাখায় পাঠিয়ে দেয়া হয় সে তালিকা এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে সংশ্লিষ্ট শাখা যেন তালিকাভূক্ত পরিবারে হুমকি দিয়ে আসে। তাছাড়াও এসব ছাত্রদেরকে গ্রামে গেলে যাতে বিনা আঘাতে ছেড়ে দেয়া না হয় তার নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে আমার গ্রামের বাড়ীতে হুমকি দেয়া হয়েছে ২৩ জুন'৯৫। হুমকি দেয়া হয়েছে বঙ্গরত্ন চাকমা (বর্তমানে লেদার ইঞ্জিনিয়ার), বিপ্লবসহ ১০/১২ জনের বাড়ীতে।

এরমধ্যে মনোৎপল চাকমা (বর্তমানে প্রভাষক, মহালছড়ি কলেজ) জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য গ্রামের বাড়ী পানছড়িতে যায়। যাওয়ার ২/১ দিন পর খাগড়াছড়ি থেকে প্রসিত চক্রের দুই ট্যাক্সী সন্ত্রাসী পানছড়ি পিসিপি অফিসে (পানছড়ি বাজারের ক্লাব) যায়। সেখান থেকে এক সন্ত্রাসী পানছড়ির এক ছাত্রকে নিয়ে মনোৎপলের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বলে যে, বড় ভাইয়েরা তাকে ক্লাবে যেতে বলেছে। মনোৎপল জানায় সে জন্ডিসে আক্রান্ত। প্রয়োজন থাকলে তাদের বাড়ীতে গিয়ে কথা বলার জন্য। এরপরই তারা ক্লাবে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে যায় এবং অর্ধেক রাস্তা থেকে পানছড়ির ছেলেটা মনোৎপলের বাড়ীতে ফিরে এসে তাকে বলে যে, খাগড়াছড়ি থেকে ১০ জন ছাত্র এসেছে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাদের গতিবিধি খুব বেশী ভাল নয়। বরং আপনি অন্যত্র চলে যান। ছেলেরা ক্লাবে ফিরে যাওয়ার পর বাকিরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং মনোৎপলের বাড়ী ঘেরাও করে। ঘেরাও করার আগেই মনোৎপল অন্যত্র চলে যায়। মনোৎপলকে না পেয়ে উচ্ছৃংখল ছেলেরা তার বাবা মাকে নির্দেশ দিয়ে আসে যে, পরের দিন বেলা ১টার মধ্যে খাগড়াছড়ির হোয়াং বই-ও বা'তে যেন মনোৎপলকে হাজির করে দেয়া হয়। মনোৎপল বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ফলে মনোৎপলকে পানছড়ি থেকে পায়ে হেঁটে ফেনী-তবলছড়ি হয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয় তার মা-বাবা এবং মনোৎপলকে ছাড়া তার মা ও তার ভগ্নিপতি দুপুর ১২টায় হোয়াং বই-ও বা'তে হাজির হয়। তাদেরকে সেখানে এক চেয়ারে ১০ ঘন্টা (রাত ১০টা পর্যন্ত) আটকে রেখে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়।

এর পরপরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সচেতন ছাত্র সমাজ একমত হয় যে, প্রসিত চক্রকে অবশ্যই হটাতে হবে, পদ্ধতিগতভাবে সংগঠন থেকে বের করে দিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজশাহী মহানগর শাখা থেকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রসিত চক্রকে হটিয়ে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সন্তোষ বিকাশ খীসা (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, নানিয়ারচর কলেজ)।

ঢাকা মহানগর কাউন্সিল

২৩ জুন '৯৫ ঢাকা মহানগর শাখার মহানগর শাখার কাউন্সিল জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়ীর টিভি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের একদিন আগে জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়ীর ছাদে ঢাকাস্থ বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেলে পড়া ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বিরাট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিটিংয়ে প্রসিত চক্র জাতীয় মুক্তির বিপক্ষে কাজ করে চলেছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। কাজেই তাদেরকে সংগঠনের কোন প্রকার পদ দেয়া যাবে না। কাউন্সিলের দিনে বড় ধরনের অনাকাংখিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাসাবো এলাকা থেকে আগত ৪০/৪৫জন ছাত্রকে কাউন্সিলর করা হয়নি, তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অপরদিকে একই এলাকা থেকে আসা প্রসিতের অনুসারীদের কাউন্সিলর করা হয়েছে। এ বিষয়টা নিয়ে হলের বাইরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতা দেবাশীষ চাকমার (বর্তমানে আমেরিকায়) সাথে বাসাবো এলাকার ছাত্র নেতা জিকো চাকমার (বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার) তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে দেবাশীষ চাকমা আনারস বিক্রেতার চাকু দিয়ে জিকোকে আঘাত করতে চেষ্টা করলে জিকো তা ধরে ফেলে। ফলে তার হাতের কয়েকটা আঙ্গুল কিছুটা কেটে যায়। এক পর্যায়ে দেবাশীষ জগন্নাথ হলের মাষ্টানদের দিয়ে জিকোকে হলের দক্ষিণ বাড়ীতে ধরে নিয়ে যায়। একটা রুমে আটকে রেখে তাকে মারধর করা হয়, তার গলার চেইন, পরনের গেঞ্জী ও মানিব্যাগ কেড়ে নেয় মাষ্টানরা। খবর পেয়ে ছাত্ররা তাকে উদ্ধার করতে যায়। তারা রুমের কাছাকাছি পৌঁছলে মাষ্টানরা তাকে ছেড়ে দেয়। বাসাবো এলাকার ছাত্ররা বাদেও প্রায় ৩০০-এর মতো প্রতিনিধি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। প্রসিতের পক্ষে মংসানু মারমা (বর্তমানে আমেরিকায়) সভাপতি প্রস্তাব করা হলে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পলাশ খীসাকে সভাপতি পদে প্রস্তাব করা হয়। এভাবে ২১টি পদের মধ্যে ১৭টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পলাশ খীসার নেতৃত্বে প্রসিত বিরোধী প্যানেল বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হলে বিজয়ী কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান তৎকালীন সভাপতি কে এস মং মারমা।

ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিলের পরপরই সমীরণ চাকমা সচিব চাকমাকে একটি চিঠির মাধ্যমে জানায় কে এস মং এর বিশ্বাসঘাতকতা ও সঞ্চয়ের নির্লিপ্ততার কারণে ঢাকা মহানগর শাখা হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ঢাকা এবং রাজশাহীতে পূর্ণ প্যানেলে প্রসিত

চক্র হেরে যাওয়ায় তারা ভোটে যেতে চায় না। সে কারণে চবি শাখার কাউন্সিল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও কেন্দ্রীয় কমিটি তা গ্রহণ করে না। ফলে কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে চবি শাখার সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির বেশ কয়েকবার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বাক-বিতন্ডা হয়।

একদিকে সচেতন ছাত্র সমাজের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও অন্যদিকে ১৫ জুন '৯৫ দুদুকছড়ায় এক প্রকাশ্য জন সমাবেশে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রসিত বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। তিনি বলেন 'হঠকারী কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে। রিক্সার পাম্প ছেড়ে, গুলতি মেরে, সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।' লিডারের এই ঐতিহাসিক বক্তব্য এবং একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাসমূহ হাত ছাড়া হওয়ায় প্রসিত চক্র বুঝতে পারে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে এবং সেই প্রতিক্রিয়া (প্রসিত বিরোধী জনমত) ছড়িয়ে যাচ্ছে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রিত শাখা দিয়ে বিরোধী শক্তিকে দমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রসিত চক্র। নানিয়ারচর শাখার তৎকালীন সভাপতি জ্যোতি লাল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৮ জুলাই '৯৫ এক সভা থেকে তৎকালীন রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি সন্তোষ বিকাশ খীসা, চবি শাখার অর্থ সম্পাদক সমর বিজয় চাকমা (বর্তমানে Task Force একাউন্টেন্ট, ব্রাক), রাজশাহী মহানগর শাখার সদস্য তোষণ চাকমা (বর্তমানে আইনজীবি) ও তৎকালীন নানিয়ারচর শাখার দপ্তর সম্পাদক সতীশ চন্দ্র চাকমাকে (৬ নভেম্বর ২০০০ চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে) মারধর করা হয়।

বর্মাছড়ি সমাবেশ

বর্মাছড়ি বাজারে একটি সমাবেশ আহ্বান করা হয় ৬ অক্টোবর '৯৫। বর্মাছড়ির নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কে কে যেতে পারবেন জানার জন্য ঢাকায় যান। সে সময় কেন্দ্রীয় দপ্তরে কেন্দ্রীয় কমিটির দীপ্তি শংকর চাকমা বাদে কেউ ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি কেন্দ্রীয় দপ্তরে গেলে বর্মাছড়ির নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং অনুরোধ করেন ৬ অক্টোবরের বর্মাছড়ির সমাবেশে আমি যাতে অংশগ্রহণ করি। আমার ৫ তারিখ একটি পরীক্ষা ছিল। তারপরও দীপ্তি শংকর ও বর্মাছড়ির নেতৃবৃন্দের অনুরোধে রাজী হয়ে বললাম আমরা দু'জন যাবো। কিভাবে যেতে হবে তা জেনে নিলাম। ৫ অক্টোবর পরীক্ষা শেষ করে জিতেন চাকমা (তৎকালীন ঢাকা মহানগরের সহ সাধারণ সম্পাদক) ও আমি বর্মাছড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা যখন চবির হাসান অতিথি ভবনে পৌছলাম তখন রাত ১১টা ১৫ মিনিট। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত যতই গভীর হচ্ছে ততই বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। খুব ভোরে আমরা যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তখনও বৃষ্টি থামেনি। তারপরও করার কিছু নেই, নির্ধারিত প্রোগ্রাম - কোন অবস্থায় বাদ দেয়া যাবে না। তাই বৃষ্টি হলেও আমরা যেতে শুরু করি। চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি বাসে উঠে নাজিরহাট ঝুমুর সিনেমা হলে নেমে সেখান থেকে বেবী ট্যাক্সীতে নানুপুর চলে গেলাম। নানুপুরে প্রায় দু'ঘন্টা অপেক্ষা করার পর একটা জীপে (চাঁদের গাড়ী) করে খিরাম পর্যন্ত গেলাম। রাস্তাগুলো এতই খারাপ যে মাঝে মধ্যে নামতে হতো। খিরাম থেকে হেঁটে বর্মাছড়ি বাজার যেতে হবে (প্রায় এক ঘন্টার রাস্তা)। হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে মাইকের আওয়াজ শোনা গেল। ঘোষক বলছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সমাবেশ শুরু হবে, আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক নিকোলাষ চাকমা, ঢাকা মহানগর শাখার প্রাক্তন অর্থ সম্পাদক চম্পানন চাকমা, ঢাবি ছাত্র মিল্টন চাকমা, আরও উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ইত্যাদি ইত্যাদি....। কিন্তু আমরা যে যাবো তা ঘোষক বলছে না। আমরা বলাবলি করছি নিকোলাষ কোন না কোনভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে। তা না হলে আমাদের নাম তো ঘোষকের হাতে থাকার কথা। তখন প্রায় ১টা বাজে আমরা সমাবেশ স্থলে পৌছি। সেখানে গিয়ে আমাদের ধারণা সত্যে পরিণত হলো। আমাদের সাথে কেউ কথা বলছে না, কেউ সৌজন্যতাও দেখালো না। যারা বার বার অনুরোধ করেছে (ঢাকায়) সমাবেশে আসার জন্য তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের কাছাকাছি। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করছে। যেখানে সমাবেশ হবে তার দক্ষিণ পূর্ব সাইডে গাছের ছায়ায় কিছু লোক (দেখে নেতা মনে হলো) দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমরা সেখানে গেলাম, হাত বাড়িয়ে আমাদের পরিচয় দিলাম। তারাও খুশী হয়ে তাদের পরিচয় দিলো। একজন কাউখালী থানা শাখার সহ সভাপতি প্রদীপ চাকমা। তিনি খুবই আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সাথে আলাপ করলেন। তাদের শাখার সাথে গাছ ব্যবসায়ীদের একটা সমস্যার কথা বললেন এবং আমরা যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকোলাষসহ গিয়ে সমাধা করে দিয়ে আসি তারও অনুরোধ জানালেন। আমরা বললাম ঠিক আছে নিকোলাষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আমরা জানতাম নিকোলাষ কোনদিন আমাদের নিতে চাইবে না। কারণ আমরা গেলে তার দুর্বলতাগুলো ধরা পড়বে। এক পর্যায়ে নিকোলাষ এসে বলল এন্ট্রি করেছি কিনা? তার কথায় আমরা আমাদের নাম ও পদবীসহ জমা দিলাম। জমা দেয়ার পর একবার আমাদের নাম মাইকে ঘোষণা করা হলো। এরপর মিছিল শুরু হলো। আমরাও মিছিলে যোগ দিলাম। মিছিলের পর সবাই (প্রদীপ বাদে) মঞ্চে উঠে গেল, আমাদের কেউ ডাকলো না। আমি প্রদীপকে বললাম চল আমরাও মঞ্চে যায়। মঞ্চে গিয়ে বক্তব্য শুরু হলো। মিল্টন, চম্পাননসহ সবাই বক্তব্য রাখলো কিন্তু ঢাকা মহানগরের সহ সাধারণ সম্পাদক হয়েও জিতেন চাকমাকে বক্তব্য দিতে দেয়া হলো না।

আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর জিতেন বলল- প্রতিবাদ করি। আমি বললাম এখানে নয়, ঢাকায় গিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত আকারে জানাবো। এমন সময় আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন ভাত খেয়েছি কিনা? তাকে বললাম ভোরে চবিতে নাস্তা করেছি, খুব বেশী ক্ষিদে নেই (যদিও ২/৩ ঘন্টা আগে থেকে ক্ষিদে শুরু হয়ে গ্যাষ্টিকের অসহ্য যন্ত্রণায় ভিতরে ভিতরে জ্বলে যাচ্ছি)। সমাবেশের পরে ভাত খেয়ে এসে শুনি প্রদীপবাবুর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা। তিনি বলেন নিকোলাষ'দা আজ আমাদের কাউখালী পৌছতে অনেক রাত হবে, রাস্তাগুলো খারাপ, সরু পথে যেতে হবে, পথে জোকের উপদ্রব বেশী। নিকোলাষ বলল দেশ-জাতের স্বার্থে সবকিছু করতে হবে। কথাগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। নিকোলাষ আমাদের বলল তোমরা থাকবে নাকি চলে যাবে? আমি বললাম যাওয়ার মতো অবস্থা থাকলে চলে যেতাম। রাস্তায় গাড়ী পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই, পথে কোন পাহাড়ী ঘর বা গ্রামও নেই যে অর্ধেক রাস্তায় থাকা যাবে। তাই এখানেই থাকতে হবে। হাজার হোক এই পাহাড়ীরা তো বাঙালীদের চাইতে খারাপ হবে না। এরপর সবাই হাটা শুরু করলাম। বর্মাছড়ি বাজার থেকে যেতে প্রথম যে

পাহাড়ী গ্রামটা ছিল সে গ্রামে রবি চেয়ারম্যানের বাসায় আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য একজন ছাত্রকে দায়িত্ব দেয়া হলো। সে একমাত্র ছেলে যে সেই গ্রাম থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে বা দেবে। ছেলেটাকে বলা হলো সে যেন নিকোলাষদের জুতাগুলো নিয়ে যায়। আমাদেরকে যে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে বাড়ীতে নিকোলাষরা তার আগের রাতে ছিল এবং জুতাগুলো রেখে গিয়েছিল। রাতে ছেলেটাকে বেড়াতে আসার জন্য বলেছিলাম। রাতে তার সাথে কথার এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করলাম সে জুতাগুলো কখন দিয়ে আসবে, কারণ তারা সেদিন রাতে চলে যাবার কথা বলেছিল। ছেলেটি বলল আগামীকাল সকাল ১০টায় একটা কর্মী সভা আছে, তখন নিয়ে যাবো। এরপর সে জানতে চাইলো আমরা যাবো কিনা কর্মী সভায়? আমরা যা বুঝার বুঝেই তাকে বললাম আমাদের কিছু কাজ আছে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। সকালে এখান থেকে ঢাকায় চলে যাবো। আমরা যাতে কর্মী সভায় থাকতে না পারি সে কারণে নিকোলাষরা আমাদেরকে মিথ্যে বলেছিল যে তারা রাতে কাউখালী চলে যাবে।

ঢাকায় ফিরে আমি টিএসসি'র দিকে যাওয়ার পথে জগন্নাথ হলের উত্তর গেইটে বড় ভাই প্রবীন খীসা তাতু (পিসিপি দলীয় পতাকার ডিজাইনার এবং বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ার), বাঞ্ছানিধি খীসা, দীপেন চাকমা (উন্নয়ন বোর্ডের কর্মরত)সহ দু'এক জনের সাথে দেখা হয়। আমার সাথে কথা আছে বলে তারা আমাকে জগন্নাথ হলের মাঠের দোকানগুলোতে নিয়ে আসে। টেনিস মাঠের উত্তর দিকে বসে চা খাচ্ছিলাম, সূর্য ডুবে গেছে, সন্ধ্যা হয়েছে। ঠিক সেই সময় টেনিস মাঠের দক্ষিণ সাইডে গাছের নীচে মারামারি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না কাকে কে মারছে। কারণ হলে সেই সময়ে ছাত্র লীগের দু'টো গ্রুপের মধ্যে প্রায় মারামারি হতো। একজনকে মারতে মারতে মাঠের মাঝখানে নিয়ে এসেছে। যে মার খাচ্ছে সে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। আমি উঠে গেলাম। মাঠে নাস্তা খাওয়া ছাত্ররাও উঠে বাঁচাতে গেলো। ফলে যারা মারছে তারা দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। গিয়ে দেখি সে ছাত্রলীগের কেউ নয়, আমাদের পাহাড়ী ছেলে চম্পানন চাকমা। আমরা যেখানে বসেছিলাম তাকে সেখানে নিয়ে আসলাম। মুখের কয়েকটা জায়গায় ফুলে গেছে। কে মেরেছে জিজ্ঞাসা করলে সে নাম জানে না বলল, তবে চেহারা চেনে। ট্রাইবেল হোষ্টেলে থাকে ছেলেগুলো। তাকে কেমন আছেন বলে হ্যান্ডসেক করার পর আমাদের সিটগুলো হারিয়েছি তোমাকেও ছাড়বো না বলে তাকে মারতে শুরু করল। চম্পাননকে নিয়ে হলের রুমে রুমে এবং আশেপাশে ছেলেগুলোকে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তাকে নিয়ে নীলক্ষেতে ডাক্তারের কাছে গেলাম। হলে এসে দেখি চোখের পাশে বড় করে ফুলে যাচ্ছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে সে। তখন আমাদের তৎকালীন ঢাকা মহানগর শাখার সহ সভাপতি বঙ্গরত্ন চাকমা তাকে নিয়ে আবারও ডাক্তারের কাছে যায়। পরে জানলাম চম্পাননকে যারা মেরেছে তারা পাহাড়ী হোষ্টেলের ছাত্র ছিল এবং চম্পাননের কারণে তারা তাদের সিটগুলো হারিয়েছে। ফলে প্রতিশোধ হিসেবে চম্পাননকে মেরেছে তারা। কোন রাজনৈতিক কারণ সেখানে ছিল না। রাতে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকা মহানগর শাখার সভা আহ্বান করলাম। মিটিংয়ে বর্মাছড়িতে মহানগর নেতৃবৃন্দকে অবমাননা করা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক নিকোলাষ চাকমার অসৌজন্যমূলক আচরণ ও মিথ্যা কথা বলা এসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির বরাবরে লিখিতভাবে জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু জানানোর পরেও তার কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

ঢাকায় নবীনবরণ

১২ ডিসেম্বর '৯৫ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ঢাকাস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভর্তি হওয়া পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের বরণ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান অতিথি ঢাবি তৎকালীন উপাচার্য এমাজউদ্দিন আহমেদকে ঠিক করা হয় এবং ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অডিটোরিয়াম ভাড়া করা হয়। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ৯-১১ ডিসেম্বর ৭২ ঘন্টার হরতাল এবং পরিবহন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ৭-৮ ডিসেম্বর দু'দিন পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। ফলে নবীন বরণ অনুষ্ঠান যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। সবচাইতে সমস্যায় পড়তে হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের কারণে। ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি করা হয় তৎকালীন পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য সৌখিন চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সভাপতি কে এস মং মারমা। কে এস মং মারমা দীর্ঘদিন যাবৎ বান্দরবানে অবস্থান করার কারণে কেন্দ্রীয় দপ্তরের সাথে তার খুব বেশী যোগাযোগ ছিল না। ফলে পিসিপি কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে ৬ ডিসেম্বর '৯৫ বলা হলো সৌখিন চাকমাকে অতিথি করা যাবে না। কারণ তিনি জুম্ম জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত, আর্মীদের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। পরের দিন কেন্দ্রীয় কমিটি লিখিতভাবে জানালো যে, সৌখিন চাকমাকে অতিথি করা যাবে না। কিন্তু বিস্তারিত কোন কারণ তারা উল্লেখ করেনি। সেই সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি গিয়ে সৌখিন চাকমার সাথে আলাপ করার সিদ্ধান্ত হলেও পরিবহন ধর্মঘটের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ৯ ডিসেম্বর ভোর রাতে তিনি ঢাকায় এসে পৌছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা সিনিয়রদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা আমাদের জানালো যেহেতু সৌখিন চাকমাকে অতিথি করা হয়েই গেছে অর্থাৎ তাকে বলা হয়েছে, আমন্ত্রণপত্রে তার নাম ছাপানো ও বিলি করা হয়েছে কাজেই তাকে বাদ দেওয়া যায় না। আমরা মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলাম যা হবার হোক আমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৌখিন চাকমা অতিথি হবেন। পরবর্তীতে সৌখিন চাকমার বিষয়ে আমরা খবর নিয়ে তেমন কিছু পেলাম না। মূল কারণ হলো সৌখিন চাকমার সাথে প্রসিতের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো নয়। প্রসিতের ভুলগুলোর একজন তীব্র সমালোচক তিনি। তাই তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অতিথি হবার কথা প্রসিতের - সাংগঠনিক দিক বিবেচনা করলে। সেই জায়গায় সৌখিন চাকমাকে অতিথি হিসেবে প্রসিতের বা তার অনুসারী পিসিপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল না। ফলে যে কোন অজুহাতে সৌখিন চাকমাকে বাদ দিতে চায় তারা। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কোন প্রকার সহযোগিতা তো দূরের কথা বরং বিরোধিতা করা হলো। অনুষ্ঠানে যাতে ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত কম হয় তার চেষ্টা করা হলো। প্রসিতের অনুসারীরা কেউই সেই অনুষ্ঠানে যায়নি। তারপরও লোকের উপস্থিতি বা শৃঙ্খলার দিক দিয়ে কোন প্রকার ঘাটতি ছিল না। অত্যন্ত সুন্দরভাবে নবীনবরণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন

১৫-১৬ ডিসেম্বর '৯৫ বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন কুতুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কুতুকছড়ি প্রসিতের সমর্থিত অঞ্চল বলা যায়। সেই প্রতিনিধি সম্মেলনে ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে আমরা তিনজন কনকবরণ ত্রিপুরা, জিতেন চাকমা ও আমি অংশগ্রহণ করি। সেই সম্মেলনে এতই শৃঙ্খলা (?) আরোপ করা হয় যে, কুতুকছড়ি শাখার পক্ষ থেকে যেখানে বলবে সেখানে আমাদের থাকতে হবে। অথচ আমি সম্মেলনের বেশ কিছুদিন পূর্বে আমার স্কুল জীবনের ঘনিষ্ট বন্ধু সুবর্ণ চাকমাকে চিঠিতে জানিয়েছি যে, প্রতিনিধি সম্মেলনের সময় আমরা তাদের বাড়ীতে থাকবো। তাদের বাড়ী বাদলছড়ি গ্রামে, বাজারের সামান্য পূর্ব দিকে। সেই অনুযায়ী সুবর্ণ আমাদের অপেক্ষায় ছিল। আমরা যখন তাদের বাসায় যেতে চাচ্ছি তখন পিসিপি নেতা অমর জীবন চাকমা যেতে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে সুবর্ণের বড় ভাই অহিংসা'দাও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন চবি শাখার নেতাদেরকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কাউকেই যেতে দিচ্ছে না অমর জীবন। অহিংসা'দা যেহেতু অভিলাষের বড় ভাই (আপন মামাতো ভাই) তাই তিনি এক প্রকার জোর করে নিয়ে গেলেন তাদের বাড়ীতে। আমি জানি না সেই সম্মেলনে আমাদের অবস্থা কি হতো। কারণ আমরা অত্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি যে, আমাদেরকে কুতুকছড়ি সম্মেলনে প্রসিত চক্র বড় ধরনের ক্ষতি করবে। তাই সুবর্ণ এবং অহিংসা'দা দু'ভাই আমাদের জন্য বাজারে অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ আমাদের অধিবেশন চলতো। তাদের বাড়ী কুতুকছড়ি বাজারের পাশে এবং এলাকার শিক্ষিত ছেলে হিসেবে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাদের সামনে আমাদেরকে কোন কিছু করা সেই সময়ে কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্মেলনে ঢাকা মহানগর শাখার উপর নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করার অপরাধে। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছি। সম্মেলনে ব্যক্তি বিশেষে আমাদেরকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক নিকোলাষ চাকমা। সে বলে "জিতেন চাকমা বর্মাছড়িতে বক্তব্য রাখতে না পারায় চম্পানন চাকমাকে ঢাকায় মারধর করা হয়েছে। চম্পাননকে মারধর করেছে পলাশ খীসার মাস্তানরা। তার সব সময় ৭/৮ জনের একটি মাস্তান বাহিনী থাকে। যাকে ইচ্ছে করে তাকে পেটায় সে তার মাস্তান বাহিনী দিয়ে।" এছাড়াও অনেক অনেক অযৌক্তিক, বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলেছিল নিকোলাষ। কেন্দ্রীয় কমিটির কোন কোন বক্তার একতরফা অযৌক্তিক সমালোচনা বিষয়ে রাঙ্গামাটি জেলার তৎকালীন সভাপতি মৃগাঙ্ক খীসাসহ অনেকেই সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য আরো মার্জিত এবং তথ্য ভিত্তিক হওয়া উচিৎ বলে শাখার নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন।

সেই প্রতিনিধি সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতা প্রতীক দেওয়ান বলেন, প্রসিত উদীয়মান সূর্যের মতো। তার যোগ্যতাকে কেউ ঢেকে রাখতে পারবে না। বিভিন্ন সময়ে শোনা যায় প্রসিত গ্রুপ বনাম সমীর গ্রুপ, প্রসিত গ্রুপ বনাম পাম্পু গ্রুপ, প্রসিত গ্রপ বনাম শক্তিমান গ্রুপ। প্রসিতকে ঘিরে প্রায় সব সময় অন্য একটা গ্রুপকে তার বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়।

৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

২০ মে '৯৬ ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ২১-২৩ মে ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঢাকায় করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ মে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং র‍্যালী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত হয়। কিন্তু বিকালে আলোচনা সভা চলাকালীন সময়ে আমাদের এক শুভাকাঙ্খী খবর দিলেন বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হতে চলেছে। আমাদের সতর্ক অবস্থায় থাকা উচিৎ। আলোচনা সভা শেষ হওয়ার পর সংক্ষিপ্তাকারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানসূচী শেষ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে সঞ্চয়, দেবাশীষ ও আমি বিভিন্ন পাহাড়ী সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করি। এছাড়াও অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ নিই। সবাই কাউন্সিল স্থগিত করে তিন পার্বত্য জেলা থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। আমরাও বিষয়টা চিন্তা করে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সবাইকে এক এক করে বিদায় দেয়া হচ্ছে। কিন্তু রাঙ্গামাটি জেলাকে বিদায় দেয়া যাচ্ছেনা জেলা শাখার সভাপতি মৃগাঙ্ক খীসা ও সাধারণ সম্পাদক বোধিসত্ত্ব চাকমাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে। সজল চাকমা চাম্পা সমস্ত জায়গা খোঁজাখুঁজি করেও পায়নি। আমার হঠাৎ মনে পড়লো সেই সময়ে সিনিয়র কয়েকজন নেতৃবৃন্দের সাথে একটি জায়গায় মত বিনিময় করার কথা ছিল তাদের। তাৎক্ষিণকভাবে আমি সেখানে গিয়ে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসলাম। তখনই সঞ্চয়দের সন্দেহ হলো যে, রাঙ্গামাটি জেলা শাখাও তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। যেহেতু মৃগাঙ্ক ও বোধি'কে আমি খুঁজে নিয়ে এসেছি।

স্থগিত করা কাউন্সিলের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করা হয় ১৮-২০ জুন '৯৬। স্থান খাগড়াছড়ি জেলা সদরে খবংপয্যা পুরাতন প্রাইমারী স্কুলে (তৎসময়ে পরিত্যক্ত)। যথারীতি কাউন্সিল শুরু হয় প্রথম দিনে ১৪২ জন প্রতিনিধি নিয়ে। দ্বিতীয় দিনে কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তৃতীয় দিনে (শেষ দিন) কাউন্সিলার সংখ্যা বেড়ে ১৬৩ জনে উন্নীত হয়। কাউন্সিলে ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয়, রাবি - এই শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দকে আসামীর মতো চোখে চোখে রাখা হতো। কাউন্সিলে ঢোকার সময় ব্যাগগুলো নিয়ে যাওয়া হতো দপ্তরে জমা রাখার কথা বলে। প্রস্রাব করতে গেলেও কমপক্ষে একজন স্বেচ্ছাসেবক সাথে যাবেই যাতে অন্য কারো সাথে কথা বলা না যায়। কাউন্সিলের এক পর্যায়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে আমাদের ঢাকা মহানগর শাখার ফাইলসহ কাগজ-পত্রগুলি নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি সরাসরি বলি- 'এসব ফাইলপত্র আমাদের দেয়া সম্ভব নয়। এখানে অনেক মূল্যবান কাগজপত্র রয়েছে।' বক্তব্য রাখার জন্য যখন মঞ্চে গেছি তখন মঞ্চের পাশে বাইরে থেকে বেড়ায় আঘাত করা হয় এবং বক্তব্য শেষ করার জন্য বলা হয়। আমার মতো রাজশাহী ও চট্টগ্রাম শাখার নেতাদেরসহ বেশ কিছু শাখার নেতাদের এরকম করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন একটা ভীতিকর পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছে যাতে কাউন্সিলররা তাদের সুচিন্তিত মতামত দিতে না পারে। তারপরও তারা যখন দেখলো যে - ভোটাভুটি হলে জিতবে না, সে কারণে তৃতীয় দিনে শাখা না থাকলেও বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার নাম দিয়ে ২১ জন কাউন্সিলর বৃদ্ধি করেছে। কাউন্সিলের শেষ অধিবেশনে সাবজেক্ট কমিটি একটি নতুন কমিটি হাউসে উপস্থাপন করে। সাবজেক্ট কমিটির ঘোষিত পদের বিপরীতে কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে নতুন নাম প্রস্তাব করা হয়। ফলে হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে ভোটাভুটি সম্পন্ন হয়ে যায়। হস্ত উত্তোলনের সময় স্বেচ্ছাসেবকরাও নিরপেক্ষ ছিল না। তারা প্রসিত চক্রের পক্ষে হস্ত উত্তোলন করার জন্য কাউন্সিলরদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাই কাউন্সিলে সাবজেক্ট কমিটির বিপরীতে প্রস্তাবিত কোন পদে কেউ জয়ী হতে পারেনি। তবে সাবজেক্ট কমিটির

ভোট যোগ করেও প্রসিত চক্রের সঞ্চয়সহ অন্যান্যরা কয়েক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদি বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার নাম দিয়ে শেষ দিনে ২১ জন অবৈধ কাউন্সিলর বৃদ্ধি না করতো তাহলে সেদিনই পদ্ধতিগতভাবে প্রসিতচক্র পিসিপি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হতো। তাছাড়াও তাদের সমর্থিত এলাকা থেকে আঞ্চলিক ও স্কুল শাখার নামে অনেক অবৈধ কাউন্সিলর নিয়ে এসেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাঘাইছড়ি থেকে ১০ জন অতিরিক্ত অবৈধ কাউন্সিলর আনা হয়েছে আঞ্চলিক ও স্কুল শাখার নাম দিয়ে। এতকিছু করার পরও প্রসিত চক্র একতরফাভাবে নিজেদের লোক দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে পারেনি। '৯৬ এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ভোটাভুটি হওয়ার বা পদ্ধতিগতভাবে প্রসিত চক্রকে পিসিপি থেকে হটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল এ কারণে যে, প্রসিতের নেতৃত্বে আলাদা একটি পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া নব্বই দশকের প্রথম দিকে শুরু হলেও '৯৫ সালের শেষের দিকে সেটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। '৯৪ এর ১৫ জুন ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নেয়ার পর প্রসিত গ্রুপিংএর মাধ্যমে গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদটি দখল করে নেয় এবং পাহাড়ী গণ পরিষদের নাম পরিবর্তন করে "জুম্ম ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট" বা "ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট" করে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে একটি পূর্ণাঙ্গ পার্টিতে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন প্রসিত। সেই সময়ে পাহাড়ী গণ পরিষদের অনেকেই বিরোধিতা করার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে গঠনতন্ত্রে উপরেল্লেখিত দু'টি নাম সন্নিবেশিত করা হয়। তখন থেকে বাইরে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনরত তিন সংগঠনের (পিসিপি, পিজিপি, এইচডব্লিউএফ) সচেতন নেতাকর্মীরা প্রসিতের বিষয়ে আরো অধিকতর সতর্ক হয়ে যায়।

১৮-২০ জুন '৯৬ কাউন্সিলের মাধ্যমে পিসিপির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২১ জুন '৯৬ খাগড়াছড়ির খবংপয্যায়। সেই মিটিংয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল ১১-১২ জুলাই '৯৬ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং ২৭ জুন '৯৬ কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলায় সড়ক অবরোধের ডাক দেয়া হয়। সেই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে জনৈক অনুপ্রবেশকারী ভিডিপির কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে জনতার উপর গুলি চালালে বাঘাইছড়ির বাবু পাড়া এলাকায় স্কুল ছাত্র রূপন চাকমা ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং অনুপ্রবেশকারীরা তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। রূপনের শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় অনুপ্রবেশকারীরা। একই দিনে তুলাবান থেকে আসার পথে মুসলিম ব্লক এলাকায় গুম করা হয় সুকেশ, মনোতোষ ও সমর বিজয় চাকমাকে। আজো পর্যন্ত তাদের খোঁজ মিলেনি। ধারণা করা হয় তাদেরকে নৃশংসভাবে খুন করেছে অনুপ্রবেশকারীরা। উল্লেখ্য যে, ১২ জুন '৯৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৬ ঘন্টার পূর্বে ছিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদিকা কল্পনা চাকমাকে কুখ্যাত লেঃ ফেরদৌস এর নেতৃত্বে অপহরণ করা হয়। আজ অবধি আমাদের প্রিয় বোন কল্পনাকে পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভা

১১ ও ১২ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হবার কথা থাকলেও একদিন আগে ঢাকায় জানানো হলো ১১ জুলাই '৯৬ তিন সংগঠনের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হবে। অথচ সেই সভার খবর পাহাড়ী গণ পরিষদের অনেকেই জানেন না। ব্যক্তিগত কাজে তখন ঢাকায় গিয়েছিলেন ভূবন ত্রিপুরা (বর্তমানে বিসিএস কর্মকর্তা)। যিনি তৎকালীন সময়ে পাহাড়ী গণ পরিষদের একজন কেন্দ্রীয় সদস্য। তিনিও এই সভার খবর জানতেন না। একদিন আগে শুনে মিটিংএ গিয়েছিলেন তিনি। সেই মিটিংএ তৎকালীন নবগঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে তিন সংগঠনের উদ্যোগে আমাদের দাবী দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেহেতু ১২ জুলাই পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে সেহেতু স্মারকলিপি লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় প্রসিতকে। প্রসিত স্মারকলিপিটি লিখে পিসিপির কেন্দ্রীয় সভা শেষ হওয়ার আগে পিসিপির নেতৃবৃন্দকে দিবেন। তিন সংগঠনের সেই মিটিংএ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রসিতের একটি প্রস্তাব। তিনি প্রস্তাব করেন যে, তিন সংগঠনের নামে একই রশিদ বই ছাপানো ও এক সাথে টাকা উত্তোলন করা এবং প্রতি তিন মাস অন্তর তিন সংগঠনের যৌথ মিটিং করা। এটাও তার আলাদা পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা হিসেবে ধরে নিয়ে প্রথমেই তৎকালীন পিসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক মৃগাঙ্ক খীসা সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন এটা একটা মৌলিক বিষয়। তাই এই মুহূর্তে আমাদের এখতিয়ার নেই তিন সংগঠনের নামে একই রশিদ বই ছাপার। প্রতিটি সংগঠন তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে তারা তিন সংগঠনের নামে রশিদ বই ছাপাবে কি-না। আর গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে হলে পিসিপিকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করতে হবে। তার সাথে একমত হয়ে থোয়াই অং মারমা, জলিমং মারমা , ভূবন ত্রিপুরা ও পলাশ খীসাসহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন। মৃগাঙ্কের বক্তব্যের বিরোধীতা করেও অনেকেই বক্তব্য রাখেন এমনকি সেদিন রবি শংকর চাকমা ও সচিব চাকমা তাকে বলেন বিরুদ্ধবাদী, সংকীর্ণমনা। উপরোক্ত শব্দদ্বয়ের (বিরুদ্ধবাদী, সংকীর্ণমনা) উপর আপত্তি জানানো হলে প্রসিত তাদের পক্ষ হয়ে ক্ষমা চান। সেদিন রণজিৎ দেওয়ান রাজু রবি শংকরের উদ্দেশ্যে বলেন- 'আলোচনা ব্যতীত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। আলোচনা করতে না দিয়ে সংকীর্ণমনা বলা- এটাও এক ধরণের সংকীর্ণতা।' এভাবে সেদিন প্রসিতের ষড়যন্ত্র রুখে দেয়া হয়।

পরের দিন ১২ জুলাই পিসিপির কেন্দ্রীয় সভার শেষ অধিবেশনে প্রসিতের লেখা দাবীদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি পৌঁছে যায়। তখন সেটি একে একে পড়ে দেখার জন্য দেয়া হয়। এসময় প্রসিতের অনুসারীরা কোথাও কোন ভুল নেই বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু যখন মৃগাঙ্ক এর পড়ার দায়িত্ব পড়লে তখন তিনি সাথে সাথে আপত্তি জানান যে, দাবীগুলোর প্রথমেই ভুল রয়েছে। প্রথম দাবীটাতে লেখা হয়েছে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে বৈঠকে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে এবং সেই বৈঠকে পিসিপি, পিজিপি, এইচডব্লিউএফ এই তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক রাখতে হবে।" তিনি বলেন সরকার কার সাথে বৈঠকে বসে সামাধান করবে এটা স্পষ্ট নয়। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির নাম উল্লেখ করতে হবে এবং তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক দাবী করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, জনসংহতি সমিতির নাম না লিখলে অস্পষ্টতা থেকে যাবে। তিন

সংগঠনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক দাবী করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল এবং আমরা তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিভাবক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি সংগঠনগুলোর জন্মের পর থেকে। অনেক যুক্তি, পাল্টা যুক্তি দেওয়ার পর প্রসিত চক্র জনসংহতি সমিতির নাম সংযোজনে রাজী হলেও পর্যবেক্ষকের বিষয়ে তারা রাজী হতে চাচ্ছিলেন না। যখন তাদেরকে বলা হলো আমরা যদি পর্যবেক্ষক এর দাবী করি তাহলে পার্বত্য বাঙালী পরিষদ জাতীয় সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোও একই দাবী করতে পারে। ফলে একটা জটিলতা সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে তারা এই যুক্তিটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। তখন থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখতে পারছিলেন না বা জনসংহতি সমিতির অধীনে তারা থাকতে চাচ্ছিলেন না এবং তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সেই কারণে তিন সংগঠনের নামে একই রশিদ বই ছাপিয়ে তারা পার্টি গঠনের প্রক্রিয়াকে একধাপ এগিয়ে নিতে চায়।

ঢাকা মহানগর কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় ৭ নেতার পদত্যাগ

৯ আগষ্ট '৯৬ ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিলের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। দুই দিন আগে ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিল পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হলেন ক্যাজারী মারমা (পিসিপির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক) এবং সদস্য হিসেবে নেয়া হয় মৃগাঙ্ক খীসা (পিসিপির তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক), খুশীরায় ত্রিপুরা (পিসিপির তৎকালীন এজিএস)/ সমারী চাকমা (সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা), সদস্য-লয়েল ডেভিড বম ও মংএচিং চাক এমং-কে। সেই মিটিংএ আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, ৮ আগষ্ট বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতিনিধিদের তালিকা কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কাছে ঢাকা মহানগর শাখাকে অবশ্যই জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের তালিকা দেয়া হলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তা যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত করে। ৯ আগষ্ট '৯৬ ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিলে প্রথম অধিবেশন জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়ী টিভি কক্ষে শুরু হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি পলাশ খীসা। এক এক করে স্বাগত বক্তব্য, অর্থ সম্পাদকের রিপোর্ট, সাংগঠনিক সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করা হয়। তারপর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অর্থ ও সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের উপর আলোচনা আরম্ভ হয়। এক পর্যায়ে জনৈক এক বক্তা ঢাকা মহানগর শাখার মনোৎপল চাকমাকে মুখোশ বাহিনীর অধিকার পত্রিকায় মুখোশ বাহিনীর ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং তিনি জানতে চান বিষয়টা সত্য কি-না? এসময় এক প্রতিনিধি সুজ্ঞান চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, মুখোশ বাহিনী তাদের পত্রিকায় কেবল মনোৎপলের কথা লিখেনি তারা এটাও লিখেছে এবং প্রচার করেছে- কবিতার পেটে প্রসিতের বাচ্চা রয়েছে। সেটাও সত্য কি-না তা তিনি জানতে চান। তখন কবিতা মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনেক আলোচনা ও পর্যালোচনার পর দুপুরের আহারের ১ ঘন্টার বিরতি দিয়ে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতেই সাবজেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে জিতেন চাকমাকে সভাপতি ও বিবিসুৎ ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যের একটি প্যানেল প্রতিনিধিদের নিকট উত্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, দুপুরের বিরতির সময়ে সাবজেক্ট কমিটি মিটিংএ বসে উক্ত প্যানেল প্রস্তুত করে। প্রসিত চক্র সেই প্যানেলের বিপরীতে দীপায়ন খীসাকে সভাপতি ও রূপক চাকমাকে (কিছুদিন আগে নিহত হন) সাধারণ সম্পাদক করে একটি পাল্টা প্যানেল প্রস্তাব করে। ফলে ভোটাভুটির প্রশ্ন এসে গেলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উপর দায়িত্ব বর্তায় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার। কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে ব্যালট পেপার তৈরী করা হয় এভাবে-

ক্রমিক নং	সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটি	পদবী	হাউস কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটি
১	জীতেন চাকমা	সভাপতি	দীপায়ন খীসা
২	বিবিসুৎ ত্রিপুরা	সাধারণ সম্পাদক	রূপক চাকমা

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে খুশীরায় ত্রিপুরা কিভাবে ভোট দিতে হবে তা প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন বাম দিকে সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির নাম এবং ডানদিকে হাউস কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির নাম রয়েছে। মাঝখানে পদবী লেখা হয়েছে। আপনারা সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির পক্ষে ভোট দিতে চাইলে বামে ঠিক চিহ্ন দিবেন এবং হাউস কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির পক্ষে ভোট দিতে চাইলে ডানে ঠিক চিহ্ন দিবেন। তিনি বলেননি যে সর্ববামে ক্রমিক নং রয়েছে এবং সেখানে ঠিক চিহ্ন দেয়া যাবে না। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ভোট গণনা শুরু হয়। গণনার সময় দীপায়ন খীসা ক্রমিক নম্বর ও নামের মাঝখানে ঠিক চিহ্ন দেয়া ভোটগুলো কি হবে এ প্রশ্ন করেন সঞ্চয় চাকমাকে। সঞ্চয় চাকমা উত্তরে বলেন যে, "এগুলো ঠিক আছে"। গণণা শেষ করে দেখা যায় যে, সাবেজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটি জয়যুক্ত হয়েছে। তখন দীপায়ন খীসা আপত্তি তুলেন ক্রমিক নম্বর ও নামে যাদের ঠিক চিহ্ন পড়েছে সে ব্যালটগুলো বাতিল করতে হবে। এধরনের ব্যালট পেপার বা ভোট ছিল মোট ৬৪টি। এই ৬৪টি ব্যালট বাতিল করলে হাউস কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটি জয়যুক্ত হয়। ভোট গণনা যখন শেষ হয় তখন রাত ১০টা বাজে। ৬৪টি ভোট বাতিল হবে কি হবে না এবিষয়টি সমাধা করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। ফলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মিটিংএ বসলে সেখানেও মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। দুইজন বাতিল করার পক্ষে এবং দুইজন বিপক্ষে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মধ্যে লয়েল ডেভিড বম-এর কাজ থাকার কারণে ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর পরই তিনি চলে যান। যে ৪ জন উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে মৃগাঙ্ক খীসা ও মংএচিং চাক এমং বাতিল করার বিপক্ষে। তাদের যুক্তি হলো, "যে ৬৪ জন ভোট দিয়েছে তাদের কোন ভুল নেই। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে খুশীরায় সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারেননি বলে ঠিক চিহ্ন নামের পাশে ক্রমিক নং এ এসে পড়েছে। তাছাড়া এটা স্পষ্ট বোঝা যায় সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটিকে সমর্থন করে বাম পাশে ভোট দিয়েছে। কারণ দুটো কমিটির মধ্যে একটা বাম পাশে আর একটা ডান পাশে। কাজেই এই গণতান্ত্রিক মতামতকে বাতিল করার ক্ষমতা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেই।" অপরপক্ষে

খুশীরায় ত্রিপুরা ও ক্যজরী মারমা সেই ভোটগুলো বাতিল করার পক্ষে। তাদের যুক্তি হলো, "তাদেরকে বাম পাশে নামের উপর ভোট দিতে বলা হয়েছে, ক্রমিক নম্বরের উপর নয়।"

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্যজরী মারমা আহ্বায়ক হিসেবে শুরুতে ভোট দিতে পারেন না। যদি সমান সমান ভোট পড়ে তখন কাষ্টিং ভোট দিতে পারেন। কিন্তু তিনি আগে থেকেই একটা পক্ষ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেন। অমীমাংসিতভাবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিটিং শেষ হয়। তখন রাত ১২টা বাজে। তখনো প্রায় ১৫০/১৬০ জন প্রতিনিধি রেজাল্টের অপেক্ষায় ছিল। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং শুরু হতে যাচ্ছে এমন সময় কাউন্সিল পরিচালনা কমিটির সদস্য মংএচিং চাক হল থেকে বের হয়ে গেলে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে প্রদীপ চাকমা (সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর) কেন্দ্রীয় কমিটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমরা আজকের মধ্যে রেজাল্ট চাই, আমাদের দ্রুত রেজাল্ট দিন।" তখন তৎকালীন সভাপতি সঞ্চয় চাকমা রাগতঃস্বরে প্রতিনিধিদের হল থেকে বের হয়ে যেতে বললে আরো বেশী উত্তেজিত হয় প্রতিনিধিরা। তখন ঢাকা মহানগরের সভাপতি পলাশ খীসা এবং থোয়াইঅং মারমা কেন্দ্রীয় মিটিংএর স্বার্থে প্রতিনিধিদের বাইরে যাওয়ার অনুরোধ করলে তারা চলে যায়। সেই সময়ে প্রসিত চক্রের অনুসারীরা অক্টোবর স্মৃতি ভবনের দিকে গেলে স্বেচ্ছাসেবকরা নিরাপত্তার কারণে হলের গেইট ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়। এরপর কেন্দ্রীয় মিটিং শুরু হলে অনুরূপ যুক্তি দিয়ে ৬৪টি ভোট বাতিল করার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়। ফলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না কেন্দ্রীয় কমিটি। এক পর্যায়ে সঞ্চয় ৬৪টি ভোট বাতিল না করলে তারা (প্রসিত চক্র) সংগঠন থেকে পদত্যাগ করবে বলে জানায়। সে মনে করেছিল তাদেরকে ছাড়া সংগঠন চলবে না। ফলে তাদের পদত্যাগের হুমকিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বাকী সদস্যরা সবাই একমত হয়ে ভোটগুলো বাতিল করে দীপায়নের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে জয়যুক্ত হিসেবে অনুমোদন করবে। কিন্তু ফল হয়ে যায় উল্টো, জলিমং মারমা (তৎকালীন সহ-সভাপতি) বলে ফেলেন যে, "ঠিক আছে পদত্যাগ করেন, আমরা সংগঠন চালাবো। তারপরও অযৌক্তিক দাবী মেনে নেব না।" ঐ সময় মৃগাংঙ্ক খীসা বলেন, "আপনারা পদত্যাগ করবেন কেন? আপনাদের উপর তো অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। প্রয়োজনে কাউন্সিল স্থগিত হবে কিংবা ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আবারও বৈঠক হবে।" এক পর্যায়ে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছে সঞ্চয়। সমারী ও মিন্টু বিকাশ খীসা প্রকৃতির ডাকের অজুহাত দেখিয়ে বাইরে যেতে চাইলে গেইট বন্ধ থাকার কারণে যেতে পারেনি। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে তালার চাবি না থাকায় স্বেচ্ছাসেবকরা তালা খুলে দিতে পারেনি। রাত বেশী হওয়ায় দারোয়ান তালা খুলে দিয়ে চলে গেছে যাতে যাওয়ার সময় রুমটি বন্ধ করে দিয়ে যেতে পারে। স্বেচ্ছাসেবকরা ভিতরে ছিল ফলে চাবি আসতে আসতে দেরী হয়ে যায়।

রাত বাড়তে থাকে। গেইট খোলা হলে সমারী, খুশীরায় ও মিন্টু বাইরে চলে যান। এর মধ্যে সৈকত দেওয়ান ও কালাবাবুকে টেলিফোন করতে দেখা যায় এবং সেখান থেকে এসে সঞ্চয়কে কানে কানে কি যেন বলে। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সমাধানের কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে না দেখে আমি ক্যজরী মারমাকে বললাম পদত্যাগ করবো ঢাকা মহানগরী সভাপতির পদ থেকে (তৎসময়ে আমি একই সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলাম)। ক্যজরী আমাকে ধৈর্য ধরতে বললেন। আমি তার কথায় বেশ কিছু সময় ধৈর্য ধরে ছিলাম। কিন্তু তারপরও সমাধানের যখন কোনো চেষ্টাই নেই বরং যে যার মতো করে ধুমপান করছে তখন আমি একটি পদত্যাগ পত্র লিখি। তাতে উল্লেখ করি যে, ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে সুষ্ঠুভাবে কাউন্সিলরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ভুল ব্যাখ্যার কারণে কাউন্সিলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দ কিংবা প্রতিনিধিবৃন্দ কোনো অবস্থাতেই দায়ী হতে পারে না। এত রাতেও (রাত তখন প্রায় ৩টা) কেন্দ্রীয় কমিটি কাউন্সিলের রেজাল্ট দিতে না পারায় ঢাকা মহানগর শাখার পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। আমি আমার পদত্যাগ পত্রটি তৎকালীন সভাপতি সঞ্চয় চাকমার হাতে দিলে তিনিও একটি পদত্যাগ পত্র লিখেন এবং স্বাক্ষর করার পর ক্যজরীকে দেন। এর পর পরই আরও তিনজন স্বাক্ষর করেন। তৎসময়ে সমারী ও মিন্টু বাইরে ছিলেন। তাদের দু'জনকে ডেকে এনে স্বাক্ষর করতে বলা হলে তারাও স্বাক্ষর করেন। ফলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ৭ জন পদত্যাগ করেন (৬ জন সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য)। তাদের পদত্যাগের পরও মৃগাঙ্ক খীসা বার বার অনুরোধ করেন "আপনারা যাবেন না, বসে পড়ুন। পদত্যাগ করা ঠিক হয়নি।" সঞ্চয় বসতে যাচ্ছে এমন সময় চম্পানন ধমক দিয়ে বলে- 'সঞ্চয়'দা, আমরা পদত্যাগ করেছি কাজেই এখান থেকে চলে যাবো।' তারপর তারা যখন হল ত্যাগ করছে তখনই ঢাকা মহানগরের কর্মীরা হাততালি দিয়ে তাদের স্বাগত জানায়। এর পর পরই কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জলিমং মারমা নবনির্বাচিত ঢাকা মহানগর কমিটিকে অনুমোদন দেন। ৭ জন কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন সহ-সভাপতি থোয়াই অং মারমা।

১০ আগষ্ট '৯৬ ঢাকায় অবস্থানরত কেন্দ্রীয় কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি জরুরী মিটিং জগন্নাথ হলের উপাসনালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিটিংএ সভাপতিসহ ৭ জনের পদত্যাগকে হঠকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা না হওয়া পর্যন্ত থোয়াই অং মারমা এবং পলাশ খীসাকে যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। পাশাপাশি সভাপতিসহ ৭ জন নেতার পদত্যাগ এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব কারা পালন করবেন এসব বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। মিটিং শেষ হওয়ার আগে (তখন রাত ৮টা) ট্রাইবেল হোষ্টেল থেকে ১০/১২ জন ছেলে মিটিংএর স্থলে আসে। তাদের কেউ কেউ হাফ প্যান্ট পরিহিত ছিল। তারা এসে সরাসরি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে কৈফিয়ত চায় যে, কেন ৭ জন নেতাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে? কাউন্সিলের রেজাল্ট কি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা ঠান্ডা মাথায় তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে জগন্নাথ হলের ছাত্ররা খবর পেয়ে ২০/৩০ জন তাদের কাছাকাছি এসে গেলে অবস্থা বেগতিক দেখে হোষ্টেলের উত্তেজিত ছাত্ররা চলে যায়। পরে জানা যায় সঞ্চয় হোষ্টেলে গিয়ে ছেলেদের ভুল বুঝিয়ে উত্তেজিত করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মারার

জন্য পাঠিয়েছে। সেদিনের মিটিংএ ২২ ও ২৩ আগষ্ট তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়। সেই বর্ধিত সভার আগে ১৭ আগষ্ট দীপ্তি শংকর চাকমা ও খুশীরায় ত্রিপুরা তথাকথিত সম্পাদকমন্ডলীর নাম দিয়ে একটি সার্কুলারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভা আহ্বান করে এবং নিজেদেরকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু সভাপতিসহ ৬ জন সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য পদত্যাগ করার পর বাস্তবিক অর্থে সম্পাদকমন্ডলী অকার্যকর হয়ে যায়। কেননা সম্পাদকমন্ডলীর মোট সদস্য হচ্ছে ১১ জন। সেখান থেকে ৬ জন পদত্যাগ করলে বাকী থাকে ৫ জন। এই ৫ জনের মধ্যে মৃগাঙ্ক খীসা ১০ আগষ্টের মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে তার মূল্যবান মতামত রেখেছিলেন। এছাড়াও গঠনতন্ত্র অনুসারে কোন সহ-সভাপতি এবং কোন সহ-সাধারণ সম্পাদক সম্পাদকমন্ডলীতে অন্তর্ভূক্ত হবেন তা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তখনো পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল না। ফলে বাকী থাকে মাত্র ২ জন। এই ২ জন কোনদিন সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। ২২-২৩ আগষ্ট কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাঙ্গামাটিতে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ২ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন করা হবে। অপরদিকে দীপ্তিশংকর ও খুশীরায় এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানায় যে, কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন ২২-২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে মহালছড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে স্পষ্টতঃ সংগঠন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এহেন অবস্থায় সমীরণ চাকমা ও শক্তিপদ ত্রিপুরা খবর নিয়ে আসেন যে, "উভয় প্রতিনিধি সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করতে হবে এবং ৫ জন করে (উভয় পক্ষ থেকে) প্রতিনিধি গিয়ে পার্টির (জেএসএস) নেতৃবৃন্দের সাথে ২ অক্টোবর '৯৬ দেখা করতে হবে।"

কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রাণনাশের চেষ্টা

আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিভাস দেওয়ানকে। আমরা জলিমং মারমা, মৃগাঙ্ক খীসা, লয়েল ডেভিড বম, জিতেন চাকমা, বিভাস দেওয়ান ও আমি ২৯ সেপ্টেম্বর'৯৬ খাগড়াছড়িতে সৌখিন চাকমার বাসায় পৌছে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর খুব ভোরে রওয়ানা হয়ে ধুদুকছড়ার দিকে হারুবিলে গিয়ে আমরা শুনি, যে রাস্তা দিয়ে যাবো সে রাস্তায় আর্মীরা তল্লাসী অভিযান চালাচ্ছে। ফলে সারাদিন সে এলাকায় কাটালাম। দুপুরে খাবার হিসেবে জুটলো কলা আর পাউরুটি। বিকেল বেলায় জলি মংএর জ্বর আসে। ধুদুকছড়ায় কোন গাড়ী না থাকায় খাগড়াছড়ি ফিরে আসতে পারছিলাম না। তাছাড়া পাবলিক গাড়ীতে আসা সম্ভব নয় প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীদের কারণে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে একটা জীপের শব্দ শুনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। গাড়ীটা ধুদুকছড়ায় যাচ্ছে। গাড়ী থামিয়ে দেখি সঞ্চয়রা যাচ্ছে। গাড়ীর ড্রাইভারকে ফিরে আসার জন্য বলে অপেক্ষায় থাকলাম। গাড়ী ফিরে আসলে আমরা খাগড়াছড়িতে সৌখিন দা'র বাসায় চলে আসি। খবর পাঠানোর জন্য বিভাস দেওয়ান চিঠি লিখে এলেন। কাজেই অপেক্ষায় থাকতে হলো। ১ অক্টোবর'৯৬ সারাদিন সৌখিন দা'র বাসায় কাটালাম। মৃগাঙ্ক খীসা ও আমি আমার বোনের বাসা মধুপুরে গেলাম। বিভাস দেওয়ান, জিতেন চাকমা ও ডেভিড বম খাগড়াপুরে শক্তিপদ ত্রিপুরার বাসায় বেড়াতে যায়। সৌখিন চাকমার বাসায় কেবল জলিমং মারমা ছিলেন। তার শরীর খুব বেশী ভালো না থাকায় তিনি বের হননি। আকাশের অবস্থা ভালো নয়, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। জলিমং তখন হারমোনিয়াম নিয়ে ভূপেন হাজারিকার একটি গান গাইছে - "মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটুখানি সহানুভূতি মানুষ কি পেতে পারে না ....."। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে মুখোশ পরিহিত একদল যুবক এসে একজন তাকে ডাকলো - "জলিমং দা' আপনি একটু বাইরে আসুন, আপনার সাথে আমাদের কথা আছে।" বিদ্যুৎ চমকানিতে জলিমং মারমা দেখেছেন মুখোশ পরিহিত অবস্থায় একদল যুবক কিরিচ, হকিষ্টিক হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সংখ্যায় ১৫/২০ জনের কম নয়। অবস্থা বুঝে তিনি বললেন - "তোমাদেরকে তো চিনি না, কথা থাকলে একজন ভিতরে এসে বললে ভালো হবে।" যুবকরা তাতে ক্ষুব্দ হয়ে বলে - "জলি মং বাইরে চলে আয়, না হলে অসুবিধা হবে।" তখন আর দাদা ডাকছে না। জলি মং মারমা উঠে যাওয়ার ভান করে দরজাটা বন্ধ করে দেয় এবং "সৌখিন দা, সৌখিন দা, এরা কারা" বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। তখন সৌখিন দা বাড়ীতে ছিলেন না। তার ডাকে সৌখিন দা'র স্ত্রী আর হ্যাপি এগিয়ে আসেন। মৃগাঙ্ক খীসা ও আমি মধুপুরের বোনের বাসা থেকে রওয়ানা হয়েছি। রিক্সা ষ্টেশনে পৌছার আগেই বৃষ্টি শুরু হলে নিপুলিকা চাকমার বাসায় উঠি। সেখানে প্রায় ঘন্টা খানেক ছিলাম। বৃষ্টি থামলে রিক্সা নিয়ে সৌখিন চাকমার বাসার দিকে যেতে থাকি। শাপলা চত্বর ফেলে গিয়ে ব্রিজটা পার হওয়ার সাথে সাথে আমার নাম ধরে একজন ডাকলেন। আমরা তারপরও যাচ্ছি। কারণ খাগড়াছড়িতে তখন একদিকে মুখোশ বাহিনী এবং অন্যদিকে প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা রয়েছে। তাই খুব সাবধানে না চললে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশী থেকে যায়। কিছুদূর অগ্রসর হতেই একটা মোটর সাইকেলে করে বিভাস দেওয়ান আর রনি আমাদের রিক্সার গতিরোধ করেন এবং বলেন অবস্থা খারাপ, রিক্সা ঘুরাও। আমরা রিক্সা ঘুরিয়ে তাদের পিছু নিলাম। পানখাইয়া পাড়া রোডে বাজারের এক হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক বাবু হংসধ্বজ চাকমার বাসায় গেলাম রাত্রি যাপনের জন্যে। সেখানে বিষয়টা বিস্তারিত শুনলাম যে, সৌখিন দা'র বাসা ঘেরাও করেছে প্রসিত চক্র। আমাদেরকে খুঁজছে। জলি মং মারমার অবস্থা কি হয়েছে রনি চাকমা জানে না। সে আমাদেরই এক শুভাকাঙ্খী। খবর পেয়ে সে মোটর সাইকেলে করে রাস্তায় আমাদের অপেক্ষায় ছিল। বিভাস দেওয়ানদের পেয়েছে খবংপয্যার ঢুকার রাস্তায়। তারপর আমাদেরকে বহু সময় অপেক্ষা করার পর আমাদের সাথে তাদের দেখা।

অনেক অনেক দিন পরে খবর পেলাম সেদিন ১ অক্টোবর'৯৬ পুলক চাকমা ও তাপস দেওয়ানের নেতৃত্বে ১৫/১৬ জনের একটা গ্রুপ সৌখিন দা'র বাসা ঘেরাও করেছে আমাদের হামলা করার জন্য। তাদের উপর নির্দেশ ছিল পলাশ খীসা, জিতেন চাকমা ও বিভাস দেওয়ানকে হত্যা করা এবং অন্যদেরকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেয়া। পুলক চাকমা ও তাপস দেওয়ান আমার স্কুলের জীবনের বন্ধু। ৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর আমরা সহপাঠী ছিলাম। কোনদিন তাদের কারোর সাথে ঝগড়া তো দূরের কথা, কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। অথচ সেদিন তারা এসেছে প্রসিত চক্রের নির্দেশে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বন্ধুকে মেরে ফেলার জন্য। আমি জানি না সেদিন আমাকে পেলে মেরে ফেলতে পারতো কিনা। পুলক চাকমা

পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে প্রসিত চক্র ত্যাগ করে চলে এসে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। অন্যদিক তাপস দেওয়ানের কোন খবর আমি জানি না। সম্ভবতঃ সে এখনো প্রসিত চক্রের সাথে রয়েছে। পরের দিন সকালে আশীষ চাকমা (প্রভাষক, পানছড়ি কলেজ) হংসধ্বজ চাকমার বাসা থেকে আমাদেরকে সৌখিন চাকমার বাসায় নিয়ে যান। সেখানে আরেক বন্ধু দেবোত্তম চাকমার (পানছড়ি) সাথে দেখা হয়। সৌখিন চাকমার বাসা যখন সন্ত্রাসীরা ঘেরাও করে ঠিক সে সময়ে তারা রিক্সায় করে আসছিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি পৌছতে না পৌছতে তাদেরকেও ঘিরে ফেলে সন্ত্রাসীরা। তাদের নাম, কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে সেরে দেয় তাদেরকে। পার্টির পক্ষ থেকে দেবোত্তম চাকমাকে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

জেএসএস নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সমঝোতা

সেদিন ২ অক্টোবর আমরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছে গেলাম সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু অবস্থায়। পরের দিন থেকে আলোচনা শুরু। প্রথম দিনে আমাদের উভয় পক্ষের কথা শুনলেন এবং কথা বললেন পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুধাসিন্ধু খীসা, চন্দ্রশেখর চাকমা ও প্রধীর তালুকদার। শেষ দিনে আসলেন পার্টি লিডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাসহ অন্য নেতৃবৃন্দ। তিনি বেশ কিছু সময় ধরে আলোচনা করার পর বললেন যে, "সঞ্চয়দের পদত্যাগ করা ঠিক হয়নি। আন্দোলনে তাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পার্টি মনে করে আন্দোলনের স্বার্থে তাদের স্ব স্ব পদে ফিরে আসা উচিৎ। কাজেই তারা যদি স্ব স্ব পদে ফিরে আসতে চায় তাহলে তোমরা (আমাদের পক্ষ) গ্রহণ করতে পারবে কিনা?" তিনি প্রথমে আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বললাম- আমরা তো তাদেরকে পদত্যাগ করতে বলিনি। তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছে। এখন যদি স্বেচ্ছায় তারা আবার ফিরে আসতে চায়, আমরা গ্রহণ করবো না কেন? তখন তাদের কাছ থেকে লিডার জানতে চাইলেন তারা ফিরে আসতে চায় কিনা? সঞ্চয় হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালে লিডার বলেন এখান-থেকে যাওয়ার পরপরই লিখিতভাবে ফিরে আসার জন্য সঞ্চয়রা আবেদন জানাবে। বর্তমানে যারা রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে তারা তা গ্রহণ করবে। সকল প্রকার মতভেদ ভুলে গিয়ে একই সাথে দেশ-জাতির জন্য কাজ করার আহ্বান জানালেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর সঞ্চয় সুস্থ হয়ে উঠলেন। উল্লেখ্য যে, সেখানে যাওয়ার পরপরই সঞ্চয় নিজেকে অসুস্থ বলেছিলেন। অসুস্থতার কথা বলে মিটিংএ খুব বেশী কথা বলেনি সঞ্চয়। বেশীর ভাগ কথাগুলো বলেছিল খুশীরায় ত্রিপুরা। লিডার যখন রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ করছিলেন বিশেষ করে পিসিপি, পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ এর কথা তথা প্রসিতের হঠকারী কার্যকলাপের কথা তখন খুশীরায় জানতে চান যে, প্রসিতকে দিয়ে আন্দোলন বা জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা? তখন লিডার বলেছিলেন, "হ্যাঁ, অনেক অনেক ক্ষতি করছে প্রসিত, অনেক গোপন তথ্য সে প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতে আরো বেশী ক্ষতি করতে পারে।" লিডারের সেইদিনের সেই ভবিষ্যত বাণী আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। প্রসিত একটি বিভেদ চক্র সৃষ্টি করে অপূরণীয় ক্ষতি করলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে।

সেদিন আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সঞ্চয়রা পদত্যাগের পর উভয় পক্ষ থেকে যে সমস্ত সার্কুলার শাখাসমূহে পাঠানো হয়েছে যৌথভাবে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করে সার্কুলারের মাধ্যমে সেগুলো বাতিল ও পুড়ে ফেলার নির্দেশ দিবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক যৌথ স্বাক্ষরে ৬ অক্টোবর '৯৬ একটা সার্কুলার শাখাসমূহের বরাবরে পাঠানো হয়। দুপুরে খাবারের বিরতির পর এবার ঢাকা মহানগর কাউন্সিলের ভোটের রেজাল্ট নিয়ে লিডার আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমার হাতে যে কাগজগুলো (হাতে একগাদা কাগজ দেখিয়ে) দেখছেন, এগুলো সব ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিলের উপর বিভিন্ন কর্নার থেকে পাওয়া রিপোর্ট। তা ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের পার্টির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের মতামতও দিয়েছেন। সব দিক আলোচনা পর্যালোচনা করে আমাদের পার্টি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ঢাকা মহানগর কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত ভোটে জীতেন-বিবিসুৎ প্যানেল জয়যুক্ত হয়েছে। কাজেই গণতান্ত্রিক এই মতামতকে তোমাদের (সঞ্চয়দের উদ্দেশ্য করে) মেনে নেয়া উচিৎ হবে বলে আমরা মনে করি।" পার্টি লিডারের এই বক্তব্যের পরও সঞ্চয়রা মেনে নিতে চায় না। তারা আবারও তাদের যুক্তি উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে। তখন লিডার আবারও বলেন, "আমি শুরুতেই বলেছি আমরা অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং তোমাদের সবার বক্তব্যও শুনেছি। সবকিছু জেনেই আমরা বলছি, তোমাদের এই মতামত মেনে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।" তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঞ্চয়রা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

এরপরের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংএ প্রসিত চক্রের দীপ্তি শংকররা আরো কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। কথা ছিল সঞ্চয়সহ যারা পদত্যাগ করেছে তারা ফিরে আসার জন্য লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাবে। কিন্তু মিটিংএ দীপ্তি শংকরদের দাবী হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পদত্যাগকারীদেরকে ফিরে আসার জন্য লিখিতভাবে আহ্বান জানাতে হবে। ঐক্যের স্বার্থে আমরা রাজী হলে লেখাটা কি রকম হবে তা নিয়ে দীপ্তি শংকর ও শুভাশীষ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে সঞ্চয়রা ফিরে এসে তাদের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে।

তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক

১০ নভেম্বর '৮৩ জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে একটি কলংকজনক দিন। এই দিনে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের হাতে আটজন সহযোগীসহ নির্মমভাবে শহীদ হন আমাদের জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম এন লারমা। ঠিক তেমনিভাবে ১০ মার্চ '৯৭ জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে রচিত হয় আরও একটি কালো অধ্যায়। ১০ নভেম্বর '৮৩ মহান নেতা এম এন লারমাকে খুন করেছে বিভেদপন্থী চক্ররা। অনুরূপভাবে ১০ মার্চ '৯৭ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণের যোগ্য নেতৃত্বকে ধ্বংস করতে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১০ মার্চ '৯৭ পিসিপি-পিজিপি-এইচডব্লিউএফ এর নাম ব্যবহার করা হয় এবং সেদিন একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সড়ক দ্বীপ থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বিলি করা হয় লিপলেটগুলো। সেই মিছিলে আমরা অনেকেই ছিলাম। সেই মিছিল থেকে এ ধরনের জুম্ম জাতীয় ঐক্য পরিপন্থী লিফলেট প্রচার করা হবে সেটা অনেকেই জানতাম না। অত্যন্ত সুকৌশলে প্রসিত চক্র এ কাজটি করেছে। এরপর এই লিফলেটটা নিয়ে প্রচন্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় প্রসিত চক্রকে। শুধু তাই

নয় লিফলেটটি রাঙামাটি পাঠানো হলে তৎকালীন রাঙামাটি জেলার সভাপতি তনয় দেওয়ান তা বিলি না করে রেখে দেন। পরে লিফলেটের বিষয়টা নিয়ে ১৯ মার্চ '৯৭ কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সভা জগন্নাথ হল উপসনালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সঞ্চয় চাকমা বলেন, "তিন সংগঠনের নামে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক অত্যন্ত যুগোপযোগী। কারণ আগামী কিছু দিনের মধ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে - যে চুক্তিতে জুম্ম জনগণের অধিকার রক্ষিত হবে না।" তিনি আরো বলেন, "তিন সংগঠনে আমাদের মধ্যকার যে মত পার্থক্য অতীতে সৃষ্টি হয়েছে সেটার জন্য আমরা কেউ দায়ী নয়। এর জন্যে একমাত্র জনসংহতি সমিতিই দায়ী। আমরা আগেও সুখে দুঃখে একসাথে কাজ করেছি, ভবিষ্যতেও করতে চাই। তাই অতীতের সমস্ত মতভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আদায়ের সংগ্রামকে আমাদের জোরদার করতে হবে।" সেদিন সঞ্চয়কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম - 'আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আন্দোলনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, সশস্ত্র না গণতান্ত্রিক?'

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, অবশ্যই সশস্ত্র। আমি আরো বলেছি যে, আপনি বলেছিলেন জনসংহতি সমিতি চুক্তি করবে, যেখানে জুম্ম জনগণের কিছুই থাকবে না। বর্তমানে আপনি কিভাবে আন্দোলন করতে চান?

তিনি বললেন, মনে করুন, আমরা যেখানে রয়েছি তার সামনে বিশাল একটি লেইক। লেইকের ওপাড়ে আমাদের অধিকারগুলো রয়েছে। আমাদের অবশ্যই সেখানে যেতে হবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

আমি আরো প্রশ্ন করলাম, আপনি তো বলেছেন সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অধিকারগুলো রয়েছে লেইকের ওপাড়ে। যেতে হলে লঞ্চে বা ইঞ্জিন চালিত নৌকায় যেতে হবে। বর্তমানে জনসংহতি সমিতিকে যদি আমরা লঞ্চ ধরি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহলে আমাদের সশস্ত্র আন্দোলনে বা জনসংহতি সমিতিতে কি যাওয়া প্রয়োজন ছিল না?

প্রত্যুত্তরে সঞ্চয় জবাব দিলেন, জনসংহতি সমিতি নামে যে লঞ্চটির কথা আপনি বললেন সেটি মোটেই চলছে না। এখনো ঘাটেই রয়েছে। সেখানে গেলেও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

আমি আরো বললাম, লঞ্চটা যখন চলছে না তাহলে লঞ্চের কোন না কোন ত্রুটি রয়েছে। হয় ফুয়েল নেই; নয়তো মেশিনের কোন যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে আছে। আমাদের কি উচিৎ নয় ত্রুটি কোথায় সেটা খুঁজে বের করে সেই লঞ্চ নিয়ে অধিকার নিয়ে আসা?

জবাবে তিনি বললেন, লঞ্চের বর্তমানে যিনি মালিক আছেন, তিনি এমনভাবে রয়েছেন মেশিনটা ধরতে, দেখতে বা চালাতে দিচ্ছেন না। কাজেই আমরা যদি সেই লঞ্চে উঠি তাহলে বেশী মানুষের ভারে লঞ্চটা ঘাটে ডুববে, কোনদিনও লেইকের ঐ পাড়ে গিয়ে অধিকার নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না।

তাহলে আমাদের কি করা উচিৎ? আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

আমাদের আবারো নতুন করে গাছ লাগিয়ে বড় করে কাঠ ছিরে লঞ্চ বানাতে হবে। সেখানে ভালো মেশিন এবং ভালো চালক দিয়ে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই কাজে আমাদের সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন বলে তিনি উত্তর দিলেন।

সেদিনের সেই মিটিংএ সঞ্চয় স্পষ্টভাবে কিছু না বললেও প্রদীপন খীসা আরো কিছুটা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা তিনি আর আন্দোলন করতে চান না, চুক্তি করতে চান। কিছু না পেলেও তিনি চুক্তি করবেন। অপর পক্ষে জনসংহতি সমিতির একটা বড় অংশ অশোক বাবুর নেতৃত্বে এখনো আন্দোলন করতে চান। সেই দিনের সেই মিটিংএ সিদ্ধান্ত হয় যে, ২১-২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। সেই মিটিংএ বিস্তারিত আলোচনা করে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী বিষয়ে মীমাংসা করা হবে। যেহেতু পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির নয়, ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় সেই দাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী বাতিল

২০-২১ এপ্রিল '৯৭ চট্টগ্রাম বুড্ডিষ্ট ফাউন্ডেশন মিলনায়নে কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে ১০ মার্চ '৯৭ সালে তিন সংগঠনের নামে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত লিপলেটের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালেচনা করা হয়। বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় কর্মী এই দাবীটা যুগোপযোগী বলে আখ্যায়িত করলেও বেশীর ভাগ প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কমিটিকে তীব্র সমালোচনা করেন। এমন যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির কিছুই বলার থাকে না। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয়, পিসিপি তার জন্মলগ্ন থেকে বলে আসছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাটাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির যখন আলোচনা কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে বলে আমরা পত্রিকায় খবর দেখছি তখন পিসিপির পক্ষ থেকে এ ধরনের লিফলেট ছাপানোর মধ্য দিয়ে সমাধানের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটি একতরফাভাবে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত (পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবী সম্বলিত লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ করা) নিতে পারে না। প্রতিনিধিদের সমালোচনা-পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের পর কেন্দ্রীয় কমিটির একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সঞ্চয় প্রস্তাব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কেবলমাত্র দু'একজন বক্তব্য রাখবেন। তখন কেন্দ্রীয় কমিটির অনেকেই তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, "যে বিষয়টা নিয়ে আজ প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে সমালোচনা করছে তার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি দায়ী নয়। কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিফলেট ছাপানো হয়নি। কাজেই প্রত্যেকের বলার রয়েছে।" ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে, সবাই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবেন বিষয়টা নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির অনেকেই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত লিফলেটের জন্য সঞ্চয়কে দায়ী করেন। সভার সমাপ্তি বক্তব্যে সঞ্চয় তার অপরাধ স্বীকার করে বলেন যে, "পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক আমি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দিয়েছি। এজন্য যদি শাস্তি ভোগ করতে হয় আমি করবো, যদি সংগঠন থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই। তবে আপনারা জেনে রাখুন আগামী জুন মাসের মধ্যে

জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে চুক্তি করবে - যে চুক্তিতে জুম্ম জনগণের কোন অধিকার সংরক্ষিত হবে না। কারণ জনসংহতি সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব অচল, ঘরের নষ্ট হওয়া খুঁটির মতো নড়েবড়ে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। তারা আর আন্দোলন করতে চায় না। তাই কোন কিছু না পেলেও জনসংহতি সমিতি চুক্তি করতে বাধ্য সরকারের সাথে।"

সেই প্রতিনিধি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী বাতিল করা হলো। তবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি মনে করেন পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবীটা যৌক্তিক তাহলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সেটা চূড়ান্ত হবে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে ৪টি মৌলিক দাবী নিয়ে পিসিপি'র ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। দাবীগুলো হলো -

১. সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।

২. ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সেনাবাহিনী ও সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. বহিরাগত বাঙালীদের ফেরত নিতে হবে।

এই ৪টি দাবীতে ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ১৭-২০ জুন '৯৭ তারিখে ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

১১ মে '৯৭ খাগড়াছড়িতে নির্মাণাধীন ষ্টেডিয়ামে রাজশাহী মহানগর শাখার সাবেক সভাপতি ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক উষাময় খীসাকে (বর্তমানে আইনজীবি) প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা দীপ্তিশংকরের নির্দেশে মারধর করে। সেদিন উষাময় ও অমিয় চাকমা (বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার) নির্মাণাধীন ষ্টেডিয়ামে ছোট বোন স্বর্ণাশ্রী ও রূপাশ্রী (তটিনী ও এল্টনি)সহ বেড়াতে গিয়েছিল। বিকাল বেলায় ষ্টেডিয়ামের গ্যালারীতে বসে তারা যখন গল্প করছিল ঠিক সেই সময়ে একজন ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করে- উষাময় কার নাম? উষাময় তখন নিজের পরিচয় দেয়। ছেলেটি বলে "আপনার সাথে কথা আছে। একটু আমার সাথে যেতে হবে।" উষাময় বিষয়টা সহজভাবে নিয়ে ছেলেটার সাথে যায়। ছেলেটা তাকে নিয়ে যায় ষ্টেডিয়ামের ভেতরের একটি রুমে। সেখানে গিয়ে দেখে অনেকগুলো ছেলে। তখন কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে উষাময়কে মারতে শুরু করে সন্ত্রাসীরা। যে যেভাবে পারে মারছে আর উষাময় চিৎকার করছে। কিন্তু শব্দটা অমিয়দের কাছে পৌঁছে না। তারা অপেক্ষা করছে উষাময় কখন আসবে। প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করেও যখন আসছে না তখন তারা খুঁজতে যায়। খুঁজতে খুঁজতে চিৎকার শুনতে পায়। দরজা খুলে দেখে উষাময়কে ১৫/২০ জন ছেলে মারছে। দরজা খোলার সাথে সাথে অমিয়কে দু'চারজন এসে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং চলে যেতে বলে। তখন অমিয়রা হুয়াং বোইও বা'তে যায়। সেটি পিসিপির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেখানে দীপ্তিশংকর ছিল। তাকে ঘটনাটা বিস্তারিত বলা হয়। কিন্তু সে জবাব দেয় অপরাধ করলে তো মার খেতে হবে। তাদের করার কিছু নেই। তখন স্বনির্ভর বাজারে আসা লোকদের কাছে উষাময়কে বাঁচানোর জন্য আহ্বান করে অমিয়রা। বাজারের আসা লোকজন উদ্ধারের জন্য গেলে সন্ত্রাসীরা চলে যায় এবং উষাময়কে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সে আপাততঃ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই সময়ের আঘাতের ব্যাথাগুলো জ্বালাতন করে। শুধু তাই নয় আমাদের পক্ষ থেকে খাগড়াছড়িতে দায়িত্ব পালনরত তনয় দেওয়ান উষাময় খীসাকে দেখাশুনা ও চিকিৎসা করার পর রাঙামাটি ফিরে আসার সময়ে ১৫ মে তারিখে তাকে খাগড়াছড়ি বাস ষ্টেশন থেকে প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা অপহরণের চেষ্টা চালায়।

কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভায় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বরখেলাপ

৬ জুন '৯৭ চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্রাবাসে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মৃগাঙ্ক খীসা যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন তার বক্তব্যের উপর কথা বলতে থাকে চম্পানন, নিকোলাষ, মিন্টুসহ আরো দু'একজন। মৃগাঙ্ক বক্তব্য রাখতে পারছেন না কারণ প্রতিটি কথায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তখন আমি সভাপতির অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করলাম- "এখানে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হবে নাকি মাছের বাজারের মতো তর্ক-বিতর্ক হবে? মাছের বাজারের মতো হলে আমিও শুরু করতে পারি কি-না? যদি না হয় তাহলে মৃগাঙ্ক বাবুকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হোক।" তখন সভাপতি হিসেবে সঞ্চয় হস্তক্ষেপ করে বলেন- একজনের বক্তব্য শেষ না হলে আরেকজন কথা বলতে পারবে না। তখনই মৃগাঙ্ক বাবু বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। তার বক্তব্যকে সমালোচনা করে প্রসিত চক্রের দু'একজন বলেছিল তিনি নাকি জনসংহতি সমিতির সদস্যের মতো বক্তব্য রাখছেন এবং তাদের দালালী করছেন। সেই মিটিংএ প্রসিত চক্রের দীপ্তি শংকর বাদে সবাই উপস্থিত ছিল। দীপ্তি শংকরও লিখিতভাবে কাগজ পাঠিয়েছে যে, সে আসতে পারবে না, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। সেদিনের মিটিংএর উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা। সে কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রসিত চক্র সবাই মিটিংএ উপস্থিত হয়। সেই মিটিংএ প্রস্তাব করা হয় যে, প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিবর্তে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত করা এবং যে ৪টি মৌলিক দাবী নিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কাউন্সিল করার সিদ্ধান্ত ছিল তা পরিবর্তন করে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী অন্তর্ভূক্ত করা। কোন প্রকার যুক্তি দেয়ার সুযোগ সেখানে দেয়া হয়নি। প্রস্তাবের পক্ষে না বিপক্ষে শুধুমাত্র এই মতামত চাওয়া হয়। যেহেতু প্রসিত চক্রের সবাই উপস্থিত কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হিসেবে সেটা চাপিয়ে দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা হচ্ছে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, এরপরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন, তারপর কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বাতিল করে দিতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করে দিতে পারে না।

শুধু তাই নয় সঞ্চয় চাকমা উদ্ধত কণ্ঠে বলেন যে, আমি পার্টির (জেএসএস) সবকিছু দেখেছি। কোথাও কিছু নেই। তাদের পক্ষে আর আন্দোলন করা সম্ভব নয়। মূলতঃ প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কে পাশ কাটিয়ে প্রসিতের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার জন্য সঞ্চয় এসব বক্তব্য দিয়েছিল।

৬ জুন '৯৭ মিটিংএর গঠনতন্ত্র পরিপন্থী সিদ্ধান্ত শাখাসমূহে প্রেরণ করলে বিভিন্ন শাখায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রথমে রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পক্ষ থেকে প্রতিবাদলিপি কেন্দ্রীয় কমিটির বরাবরে প্রেরণ করা হয়। এর পরপরই ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহানগর ও রাজশাহী মহানগর শাখাসহ (সবগুলো জেলা শাখা মর্যাদা সম্পন্ন) বিভিন্ন থানা শাখা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির গঠনতন্ত্র পরিপন্থী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত করা ও ৪টি মৌলিক দাবী সমুন্নত রাখার আহ্বান জানানো হয়। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে থোয়াইঅং, জলি মং, পলাশ, মৃগাঙ্ক, ব্রজ কিশোর ও ডেভিড বমসহ ১২ জন কেন্দ্রীয় নেতা কর্তৃক শাখাসমূহের আবেদন গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ণ করার আহ্বান জানানো হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে। গঠনতন্ত্রের ১৯ নং ধারার (চ) উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত যদি দু'টি জেলা শাখা মর্যাদা সম্পন্ন শাখা লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের দ্বিমত অথবা অনাস্থা জ্ঞাপন করলে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ২১ দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করে জনমত যাচাই করতে হয় এবং এই মেয়াদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি যেকোন বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বৈধতা হারায়। প্রতিনিধি সম্মেলনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত দিলে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। অথচ ৫টি জেলা শাখা (৭টির মধ্যে)/ জেলা মর্যাদা সম্পন্ন শাখা দাবী জানানোর পরও কোন বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করা হয়নি। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লেখার জন্য রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি তনয় দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক বোধিসত্ব চাকমাকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সঞ্চয়। অন্যথায় তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে। এখানেও তিনি গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করেন। গঠনতন্ত্র মোতাবেক কোন সদস্য অপরাধ করলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থণের জন্য ১৫ দিন সময় দিতে হয় এবং সংগঠনের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ দলিলে স্বাক্ষর করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। অথচ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সময় দেয়া হয়েছে মাত্র ৩ দিন (৭২ ঘন্টা) এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলারে সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর না করে স্বাক্ষর করেছেন সভাপতি হিসেবে সঞ্চয়। ৫টি জেলা শাখা মর্যাদা সম্পন্ন শাখা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ১২ জন নেতৃবৃন্দের যৌক্তিক দাবীর পরও প্রসিত চক্রের অন্যতম সহযোগী সঞ্চয় গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বীরদর্পে ঘোষণা করে যে, কেন্দ্রীয় কমিটিসহ শাখা সমূহ থেকে কেউ না গেলেও তিনি পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী নিয়ে খাগড়াছড়িতে ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল করবেন, এমনকি বোমা ফাটালে কিংবা তাকে গুলি করে মেরে ফেললেও তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না।

প্রসিতচক্রের মুখোশ উন্মোচিত

সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রসিতের ষড়যন্ত্র ও কুপরামর্শ। পিসিপিসহ তিন সংগঠনকে দুর্বল করার জন্য দীর্ঘদিনের তিল তিল করে যে সংগ্রামী ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছিল তা খন্ডিত করার মধ্য দিয়ে তার ক্ষতিসাধন করা হয়। সমস্ত গণতান্ত্রিক ও গঠনতান্ত্রিক নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে প্রসিত চক্রের সহযোগী সঞ্চয় সংগঠনের ক্ষুদ্র একটি অংশকে নিয়ে খাগড়াছড়িতে ১৭ জুন '৯৭ তারিখ ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলে ১৮ জুন '৯৭ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রগতিশীল বৃহৎ অংশটি গঠনতন্ত্রকে সর্বোচ্চ মেনে চলার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্রাবাসে বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন করতে বাধ্য হয়। সে প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন বিকাল ৫ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ৩০ জুন '৯৭ ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১-২ জুলাই '৯৭ ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল করার ঘোষণা দেয়া হয়। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান মৃগাঙ্ক খীসা এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তৎকালীন ছাত্র নেতা থোয়াই অং মারমা, জলি মং মারমা, পলাশ খীসা ও মৃগাঙ্ক খীসা প্রমুখ। এভাবে প্রিয় লড়াকু সংগঠন পিসিপি'র গৌরবময় ইতিহাসে প্রসিত চক্ররা কালিমা লেপন করে, সংগঠনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তির উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে।

প্রসিত চক্রের মূল ভিত্তিটা খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীক। ফলে ১৭-২০ জুন '৯৭ অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ির একাংশ, দীঘিনালা, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর, রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর ও কুতুকছড়ি শাখা সমূহ থেকে যোগদান করে। অন্যান্য এলাকা থেকেও ছিটেফোটা দু'একজন বিপদগামী কর্মী যোগদান করে। অপরদিকে সংগঠনের মূল নীতি-আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুসারে অনুষ্ঠিত ৩০ জুন '৯৭ ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মহানগর, বান্দরবন জেলাধীন সকল শাখা, রাঙ্গামাটি জেলাধীন কুতুকছড়ি ও নানিয়ারচর ব্যতীত সকল শাখা, খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা থানা শাখা, জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুব ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন শাখা থেকে সক্রিয়, ত্যাগী ও আদর্শিক কর্মীরা অনেকেই যোগদান করে। তৎসময়ে মানিকছড়ি ও রামগড়ে সংগঠনের শাখা ছিল না। লক্ষীছড়ি ও গুইমারা শাখা ছিল নিষ্ক্রিয়। তারা কোন পক্ষে যোগদান করেনি।

সাংগঠনিক কাজে প্রসিতচক্রের প্রতিবন্ধকতা

পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের নামে প্রসিত চক্র পিসিপি'র মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সংগঠনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য এবং জনমনে যে সকল বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে সাংগঠনিক সফর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি টীম জলি মং মারমা, মৃগাঙ্ক খীসা, ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, মনিন্দ্র চাকমা ও আমি প্রসিতের ঘাঁটি হিসেবে খ্যাত খাগড়াছড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করি। আগষ্ট মাসের শুরুতেই দীঘিনালার বাবুছড়া, বড়াদমসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় মতবিনিময় করি এলাকার মুরুব্বী ও ছাত্র যুবকদের সাথে। মতবিনিময় করার পর বিশেষ করে এলাকার ছাত্র-যুবকদের অনুরোধে এবং মুরুব্বীদের পরামর্শে ৪ আগষ্ট '৯৭ বড়াদমে পিসিপি, দীঘিনালা থানা শাখার কাউন্সিল করার সিদ্ধান্ত হয়। ৩ আগষ্ট '৯৭ সবাই বসে একটি খসড়া কমিটিও প্রস্তুত করি। কিন্তু ৪ আগষ্ট সকালে খবর পেলাম প্রসিত চক্র আমাদের মনোনীত সভাপতিসহ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে, হুমকি দিয়েছে কাউন্সিলে না আসার জন্য এবং তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে কাউন্সিল স্থলে হামলা করার জন্য।

আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার কথা ছিল সকাল ১০টায়। তার আগে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বড়াদমসহ অন্যান্য জায়গার উপস্থিত ছাত্র-যুবক ও অভিভাবকদের সাথে প্রসিত চক্রের কর্মকান্ডের বিষয়ে আলাপ করালাম। বড়াদমের ছাত্র-যুবক বন্ধুরা আমাদের আশ্বস্ত করলো বড়াদমে এসে হামলা করার দুঃসাহস প্রসিত চক্রের নেই। যদি হামলা করে তাহলে একজনকেও সুস্থ শরীরে ফেরৎ দেওয়া হবে না। বড়াদমের সেই সাহসী বৃদ্ধদের যে অপরিসীম সাহস ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কাউন্সিল করার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি চলতে থাকলো। আমরা যখন অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি ঠিক সেই সময়ে ধর্মজ্যোতির নেতৃত্বে প্রসিত চক্র আমাদের কাউন্সিল স্থলে এসে যায় এবং আমাদেরকে কাউন্সিল না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ধর্মজ্যোতির বক্তব্য হলো পিসিপি-র থানা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে সে রয়েছে। তাকে না জানিয়ে আমরা কাউন্সিল করতে যাচ্ছি কেন? অথচ আমরা যখন বাবুছড়ায় মিটিং করেছি সেই সময়ে ধর্মজ্যোতির সাথে আলাপ হয়েছে। তারপরও তাদেরকে আমি বুঝিয়ে বললাম যে, পিসিপি থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের নাম দিয়ে বের হয়ে গেছে। আমরা মৌলিক দাবীগুলি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। কাজেই এটা স্পষ্ট যে এখন পিসিপি-তে দুটো ধারা সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা যদি আমাদেরকে বিশ্বাস করে থাক এবং আমাদের দাবীর সাথে একাত্ম হতে পার তাহলে কাউন্সিলে ঢুকে পড়। আর যদি পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনে বিশ্বাস কর তাহলে কোন প্রকার ঝামেলা করার চেষ্টা না করে এখান থেকে চলে যাও। আমরা কাউন্সিলের তারিখ নির্ধারণ করেছি, কাউন্সিল অবশ্যই হবে। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রসিত চক্র সেদিন পিছু হতে যায়। আমরা সুশৃঙ্খলভাবে দীঘিনালা থানা শাখার কাউন্সিল সুসম্পন্ন করি।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমরা পানছড়ি পৌঁছে যায়। ৫ আগষ্ট'৯৭ পিসিপি পানছড়ি থানা শাখার কর্মী সমাবেশ পূর্ব নির্ধারিত ছিল। পানছড়ি কর্মী সমাবেশ হওয়ার কথা সকাল ১০টায় বাজারের পাশে একটি ক্লাবে। কিন্তু সেদিন ৯টার আগে প্রসিত চক্রের অনিমেষ চাকমার (পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে প্রসিত চক্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে) নেতৃত্বে ৮/১০ জন সন্ত্রাসী ক্লাবে অবস্থান গ্রহণ করে। আমাদের কর্মীরা তাদেরকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য বললে তারা অপারগতা প্রকাশ করে এবং বলে যে পলাশ, জলিমং, মৃগাঙ্ক কাউকে ক্লাবে ঢুকতে দেবে না। তখন আমাদের ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। পরবর্তীতে আমাদের ব্যাপক কর্মীর সমাগম ঘটলে প্রসিত চক্র সুর পাল্টায়। তখন বলে- তারা আসতে পারবে কিন্তু প্রসিত বিরোধী কোন বক্তব্য দিতে পারবে না। তখন আমাদের কর্মীরা তাদেরকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বের করে দেওয়ার অনুমতি চায়। আমরা অনেক কিছু ভেবে তা অনুমোদন করিনি। প্রথমতঃ আমরা কারও সাথে সংঘাত হোক সেটা চায় না। তাছাড়া তাদেরকে মারধর করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ সেদিন ছিল বাজারের দিন। প্রসিত চক্র মার খেয়ে যদি বাজারে গিয়ে কোন বাঙ্গালীকে মারধর করে তাহলে পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেবে। তাই সবকিছু বিবেচনা করে পূর্ব নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে বৌদ্ধ বিহারের পাশে কর্মী সমাবেশ শুরু করি। এমন সময় খবর এলো প্রসিত চক্র পেরাছড়াস্থ গিরিফুল শিশু সদন এলাকায় গাড়ী থামিয়ে তল্লাসী চালাচ্ছে আমাদেরকে অপহরণ, হত্যা বা গুম করার জন্য। কাজেই আমরা যেন পানছড়িতে অবস্থান করি। আমাদের কর্মী সমাবেশ যখন শেষ পর্যায়ে তখন খাগড়াছড়ি থেকে একটা চাঁদের গাড়ী (জীপ) নিয়ে আমাদের সমর্থিত ২০/২৫ জন ছাত্র পৌঁছে যায় আমাদেরকে নিয়ে আসার জন্য। আসার পথে গিরিফুল এলাকায় কিরিচ, হকিষ্টিক নিয়ে ১০/১৫ জন প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীকে দেখা যায়। আমাদের ছাত্র সংখ্যা বেশী হওয়ায় তারা হামলা করার সাহস পায়নি।

৪ সেপ্টেম্বর'৯৭ খাগড়াছড়ি জেলার মাইচছড়ির বলিপাড়া বৌদ্ধ বিহারে পিসিপি এক জনসভা আয়োজন করলে চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী প্রসিত চক্র সমাবেশ শুরুর আগে হামলা চালায়। সেখানে ছাত্র নেতা নয়ন জ্যোতি চাকমাকে মারধর করে মারাত্মকভাবে আহত করে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের কায়দায় তার হাত ও পায়ের রগ কেটে দেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় ছাত্র জনতা সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে চলে যাওয়ার সময় তৎকালীন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জলিমং মারমার ব্যবহৃত ব্যাগ ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাবেশ ভন্ডুল করে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে আঘাত করা। সে সময় টার্গেট করা নেতৃবৃন্দ না থাকায় তারা নয়ন জ্যোতির উপর হামলা চালায়। তাদের সে দিনের উদ্দেশ্য সফল করতে দেয়নি মাইচছড়ির সচেতন ছাত্র-জনতা।

শুধু তাই নয়, ঘাগড়াতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বর্তমান বিভেদের কারণ ও সঠিক পথটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য ঘাগড়ার ইউপি কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মী সভায় প্রসিতের পকেটকর্মী ও স্থানীয় সন্ত্রাসী বাবুর্শে মারমার (পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বপক্ষ ত্যাগ করেন) নেতৃত্বে কয়েকজন কর্মী তনয় দেওয়ান ও বোধিসত্ব চাকমার উপস্থিতিতে কর্মী সভা আয়োজনে বাঁধা প্রদানের চেষ্টা করে। এসময় ঘাগড়ার দোদুল্যমান কর্মীরা বাবুর্শের এহেন আচরণ দেখলে নিজেরাই প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসে এবং বাবুর্শে মারমাকে তার সাঙ্গপাঙ্গসহ হলরুম থেকে বের করে দেয়। অনুরূপভাবে নান্যাচর থানা সদরে সন্তোষ বিকাশ খীসা, বোধিসত্ব চাকমা ও সুদীর্ঘ চাকমার নেতৃত্বে একদল কর্মী সাংগঠনিক সফরে গেলে নান্যাচর বাজারে প্রসিত চক্রের পকেট কর্মী তপনজ্যোতি ও উথোয়াইচিং মারমা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করেন। পরে সেখানে খুল্যাং পাড়ায় আয়োজিত জনসভায় তারা আবার বাঁধা প্রদানের চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণের তরফ থেকে তখন তাদের বলা হয় যে, এভাবে বাঁধা না দিয়ে তোমাদের যা বলার আছে তা মিটিংএ এসে বলো। তখন উথোয়াইচিং মারমা জনতার রোষ দেখে সুর পাল্টিয়ে জনসভায় বলে যে, আমরা জনসংহতি সমিতির বিপক্ষে নই। জনসংহতি সমিতি যা বলবে তাই আমরা মেনে নেবো। তখন আমাদের নেতৃবৃন্দ বলেন যে, তাহলে তোমরা কার ইঙ্গিতে বাঁধা দিচ্ছো? তখন তারা কোন যুক্তি দেখাতে না পেরে জনসভার স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রতিটি এলাকায় যেখানে প্রসিত চক্রের লোকজন রয়েছে সেখানে তারা মরণপণ বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের দুর্বলতা ছিল যে, তাদের সমর্থিত এলাকায় যদি আমরা প্রসিতের কুকীর্তিগুলো তুলে ধরি তাহলে তারা জনসমর্থন হারাবে। ফলে কোন অবস্থায় তাদের সমর্থিত এলাকায় বিনা বাঁধায় সমাবেশ বা মত বিনিময় সভা করতে দেয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর

২ ডিসেম্বর '৯৭ প্রসিত চক্রের সমস্ত বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত করে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রসিত

চক্রের সমস্ত বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তাদের অন্ধ সমর্থকদের আরো অন্ধ করে রাখার জন্য সেদিনই বিকালে ঢাবি'র সড়ক দ্বীপে একটি মিছিল শেষে সমাবেশের মধ্য দিয়ে প্রসিত চক্র চুক্তির কপি নাম দিয়ে একগাদা কাগজ পুড়িয়ে ফেলে এবং বলে সরকার ও জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তিতে জুম্ম জনগণের কোন অধিকার অর্জিত হয়নি। এটা ছিল কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। কারণ প্রসিত চক্র নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ১০ মার্চ '৯৭ থেকে বৈঠক প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আসছিল। তখন থেকে তারা বিশ্বাস করতো জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যেমে চুক্তি করতে যাচ্ছে '৯৭ সালের জুন মাসের মধ্যে, যে চুক্তিতে জুম্ম জনগণের অধিকার বা স্বার্থ অর্জিত হবে না। তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে, জনসংহতি সমিতির বিরাট একটা অংশ চুক্তির বিরোধিতা করবে, অস্ত্র জমা দেবে না এবং সেই অংশটির সাথে তারা একাত্ম হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তাদের সেই আশা ও বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে, জুম্ম জনগণের ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে। আমরা যারা পিসিপির মূল ধারায় কাজ করে চলেছি অর্থাৎ সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রেখে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথ নিয়ে কাজ করে চলেছি চুক্তি হওয়ার সাথে সাথে আমরা চুক্তিকে সমর্থন করিনি। চুক্তির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে এবং পাশাপাশি জেলা পরিষদের আইনগুলো (১৯৮৯) দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে জুম্ম জনগণের ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে। আমরা এই চুক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের অগ্রগতির একটি উল্লেখ্যযোগ্য ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করে ৬ ডিসেম্বর '৯৭ খাগড়াছড়িতে ও ১৫ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটিতে চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করি।

জেএসএস সদস্যদের অস্ত্র জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত পত্রপত্রিকার লেখা ও বক্তব্যে প্রসিত চক্রের আক্রমণের টার্গেট ছিলেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা ও তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য অস্ত্র জমা দেয়ায় প্রসিত চক্রের নেতৃত্ব কর্মীদের ক্ষোভের মধ্যে পড়েন। কেননা প্রসিত চক্র বলেছিল জনসংহতি সমিতির একটা বিরাট অংশ অস্ত্র জমা দেবে না। অথচ তারা সবাই অস্ত্র জমা দিলেন কেন- কর্মীদের এই প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হলো। সেদিন প্রসিত চক্র কর্মীদের এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, কিছু দিনের মধ্যে আমাদের অটোমেটিক হাতিয়ার আসবে। কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরে অটোমেটিক হাতিয়ার দেখতে না পেয়ে কর্মীরা আরো ক্ষুব্দ হয়। ফলে প্রসিত চক্র ছলনার আশ্রয় নেয়। বিশ্বস্থ কর্মীদের দিয়ে নকল অটোমেটিক হাতিয়ার সাধারণ কর্মীদের দেখায়। প্রসিত চক্রের এ ধরনের ভন্ডামী দেখে অনেকেই স্বপক্ষ ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। অবশ্যই জনসংহতি সমিতির একটা অংশকে নিজেদের পক্ষে রাখার কম চেষ্টা করেনি তারা। চুক্তির পর পরই তাদের এক পকেট সাংবাদিককে দিয়ে আজকের কাগজে একটি রিপোর্ট লিখে দেয় যে, মেজর বাতায়ন তার গ্রুপ নিয়ে বিদ্রোহ করেছে। সে অস্ত্র জমা দিতে চায় না। কিন্তু সন্তু লারমার অনুগত বাহিনী তাকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করেছে। এভাবে তারা পার্টির অভ্যন্তরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে প্রসিত চক্রের টার্গেট হয়ে যায় পুরো পার্টি, অস্ত্র জমাদানকারী সকল সদস্য ও তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রসিতচক্রের হত্যার রাজনীতি শুরু

চুক্তির পর পরই প্রসিত চক্র হত্যার রাজনীতি শুরু করে। সর্ব প্রথমে তারা খুন করে কুতুকছড়ির অশ্বিনী কুমার চাকমাকে। অশ্বিনী কুমার চাকমা ছিলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মরত কুমার চাকমার ছোট ভাই। মরত কুমার ছিলেন চুক্তির একজন সমর্থক। তার দু'ছেলেও চুক্তি পক্ষের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাথে যুক্ত ছিল। ১৬ জানুয়ারী '৯৮ চুক্তির সমর্থনে কুতুকছড়ি বাজারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রসিত চক্রের বাঁধা সত্ত্বেও অনেক লোক জমায়েত হয় সেখানে। সেই সমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে মরত কুমারের ভূমিকা ছিল নজরে পড়ার মতো। অশ্বিনী কুমারও সেই সমাবেশে যোগ দেন। দু'দিন পর ১৮ জানুয়ারী '৯৮ প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা মরত কুমারকে মারার জন্য যায়। তাকে না পেয়ে তার ছোট ভাই অশ্বিনী কুমার চাকমার উপর আক্রমণ চালায়। কিছু সময় মার খাওয়ার পর অশ্বিনী কুমার আত্মরক্ষার জন্য কোদাল হাতে নিলে প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা চারদিকে ঘিরে পাথর ছুড়ে মারতে থাকে। অশ্বিনী বাঁচার জন্য আর্মী ক্যাম্পের দিকে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এতগুলো সন্ত্রাসীর সাথে একজনের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। একটার পর একটা পাথর দিয়ে বার বার আঘাত করতে থাকে সন্ত্রাসীরা। ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। এভাবেই চুক্তি বিরোধীদের হাতে প্রথম জীবন দিলেন অশ্বিনী কুমার চাকমা। রেখে গেলেন ছেলেমেয়েসহ অসহায়ভাবে নিজের স্ত্রীকে। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কেটে যেতে থাকে অশ্বিনীর বিধবা স্ত্রীর দিনকাল। কিছুদিন আগে প্রসিত চক্রের তথাকথিত এক নেতা তার প্রতি দরদ দেখিয়ে মদ বিক্রির অনুমতি দেয়। মদ বিক্রি করে কোন মতে চলছে বিধবার অভাবী সংসার।

অশ্বিনীর মৃত্যুর পর দাহক্রিয়ার যাওয়ার জন্য যখন আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মিটিং চলছিল তখনই ছাত্রনেতা বোধিসত্ব চাকমা সরেজমিনে ঘুরে এসে রিপোর্ট দেয় যে, প্রসিত চক্র রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। তারা চুক্তির যে কোন সমর্থককে খুন করতে পারে। যদি অশ্বিনীর দাহক্রিয়ায় যাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের আঘাত করবে তারা। স্থল বা নৌ পথ কোনটাই নিরাপদ নয়। তারপরও আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম উপস্থিত সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দাহক্রিয়ায় যাবো। একটা বাস ও একটা মাইক্রো নিয়ে ৬০/৭০ জনের একটা দল তৎকালীন সভাপতি থোয়াই অং মারমার নেতৃত্বে দাহ অনুষ্ঠানে যায়। যাবার পথে প্রসিত চক্রের অন্যতম সহযোগী অভিলাষসহ ৪/৫ জনকে দেখতে পেয়ে আমাদের কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে। আমরা গাড়ী না থামিয়ে কর্মীদের বলি আমরা অশ্বিনীর দাহক্রিয়ায় যাচ্ছি। তাই প্রধান হচ্ছে দাহক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া নয়। আমরা অশ্বিনীর বাড়ীতে পৌছলে শত শত জনতা আমাদের স্বাগত জানান। তাদের চোখেমুখে ছিল শোকের ছায়া আর আতংকের প্রতিচ্ছবি। আমরা তাদের সাথে মত বিনিময় করি। তারা আমাদের জানান যে, তারা খুবই অসহায়, সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। ফলে তারা চান না অশ্বিনীকে রাজনৈতিক মর্যাদায় দাহ করা হোক। এরমধ্যে আমরা খবর পেলাম সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে হামলা করার জন্য অপেক্ষা করছে। দাহক্রিয়া ঘন্টা দু'য়েক দেরী হতে পারে জেনে আমরা সেখান হতে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে এলাম।

বাজারে হামলা করার কথা শোনা গেলেও কেউ কিছু করেনি। আমরা আসতে থাকলাম। কিছুদূর এসে দেখা গেল অভিলাষসহ কয়েকজন রাস্তার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করছে। আমাদের কর্মীরা তাদেরকে ধাওয়া করতে চাইলেও আমরা দিইনি। কিছু দূর এসে দেখি আবাসিক স্কুলের কাছে ধর্মঘরের পাশে সন্ত্রাসীরা ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে এবং তিন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হামলার জন্য অবস্থান করছে। তখন আর কোন উপায় না দেখে আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। মুহূর্তেই মধ্যে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে ব্যারিকেড ভেঙ্গে ফেলে আমাদের কর্মীরা। সেদিন দেখেছি প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীদের ভীরুতা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের উপর হামলা করা। কিন্তু আমাদের কর্মীরা গাড়ী থেকে হুংকার দিয়ে নামার সাথে সাথে তারা পালিয়ে যায়। আমরাও নিরাপদে চলে আসি।

জনসংহতি সমিতির সদস্যরা অস্ত্র জমা দেয়ার পর পরই প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা শুরু করে সমিতির সদস্যদের আপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়। সমিতির যে কোন সদস্যকে পেলেই সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেয়। তাদের ক্ষোভের কারণ হলো সমিতির সদস্যরা তাদের পক্ষ না নিয়ে কেন সন্তু লারমার স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্র জমা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা অনুদান নিয়েছেন। ৫০ হাজার টাকা একটা পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য খুবই নগণ্য। সেই টাকায় জায়গা ক্রয় করা তো দূরের কথা চলনসই একটা বাড়ী বানানোর জন্যও যথেষ্ট নয়। ফলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ৫০ হাজার টাকা। এমন পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে ৫০ হাজার টাকার দাবী মেটাতে সমিতির সদস্যদেরকে বাপ-দাদার ভিটেমাটি বিক্রি করে দেয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। এভাবে প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীদের অপহরণের টাকা যোগাড় করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় পার্টির অনেক অনেক সদস্য-পরিবার।

জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের মধ্য দিয়ে খুব বেশীদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি প্রসিত চক্র। কিছুদিনের মধ্যে তারা শুরু করে হত্যার রাজনীতি। দু' যুগের অধিক সশস্ত্র আন্দোলনে যারা সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে, যারা বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রু সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে অস্ত্র গোলাবারুদ ছিনিয়ে এনেছেন তারাই ছিল সন্ত্রাসীদের সবচেয়ে টার্গেট। ফলে বীর যোদ্ধা শহীদ তার্জেন, অর্জিন, অরুণ, স্বাধীন, লাব্বেসহ মোট ৪১ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যকে প্রসিত চক্র খুন করেছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা দীর্ঘ দু' যুগ ধরে শত্রুর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হননি, আর্মীদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হয়েছে সেই সকল বীর যোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেয়ার পর নিজের জাতির বিপথগামী ও বেঈমানদের নগ্ন হাতে জীবন দিচ্ছেন এটা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ও মর্মান্তিক।

অস্ত্র জমা দেয়ার পর চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করতে থাকে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা। কোনো কোনো এলাকার গ্রামের বাড়ীতে থাকতে পারে না কখন সন্ত্রাসীরা এসে অপহরণ করে, খুন করে। রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি আসা-যাওয়া করা যায় না নিরাপত্তার অভাবে। কুতুকছড়িসহ দু'একটি জায়গায় সন্ত্রাসীরা গাড়ী তল্লাসী চালিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। নিয়ে গেলে আর ফেরৎ আসে না। ফেরৎ আসলেও হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে নিজের পরিবারকে নিঃস্ব করে। পানছড়ি থেকে খাগড়াছড়ি কিংবা খাগড়াছড়ি থেকে পানছড়ি যাওয়া যায় না পেরাছড়াস্থ গিরিফুল এলাকায় অস্ত্রের মুখে সন্ত্রাসীরা বাস থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। উঠিয়ে নিয়ে গেলে পরিণতি যা হবার তা হয়ে যায়।

সমঝোতার পরও প্রসিতচক্রের তাণ্ডব

নিজের জাতির ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে - প্রতিরোধ করেছে তাদের পক্ষে এধরনের একটা জীবন মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি, হতে পারে না। ফলে প্রসিত চক্রের বিরুদ্ধেও তারা রুখে দাঁড়ায় নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য। আর তখনই প্রসিত চক্র বুঝতে পারে তাদের সন্ত্রাসীদের শক্তি সাহস কতটুকু। তাদের কেউ কেউ পালিয়ে যায় ইপিজেড-এ, কেউ যায় ঢাকায়। যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তারা চাপ সৃষ্টি করে প্রসিতকে সমঝোতা করার জন্য। সমঝোতা প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয় প্রসিত। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকেও তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়া হয়। কারণ জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে- 'শত্রুকে নিরপেক্ষ করা, নিরপেক্ষকে সক্রিয় করা এবং সক্রিয়কে আরো অধিকতর সক্রিয় করা।' পার্টির সাংগঠনিক এই নীতি অনুযায়ী প্রসিত চক্রের সাথে সমঝোতার জন্য বৈঠক করে ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে খাগড়াছড়ির নারায়ণখাইয়ার অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীতে। সেখানে জেএসএস এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন তাতিন্দ্র লাল চাকমা (মেজর পেলে)। প্রসিত চক্রের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দীপ্তি শংকর চাকমা। উভয় পক্ষ একমত হয়ে সমঝোতা চুক্তি করেন যে,

১. ইতিমধ্যে যারা অপহৃত হয়েছেন তাদের উদ্ধারকল্পে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সগযোগিতা প্রদান করবে।

২. উভয় পক্ষ চলাফেরা কালীন কোন প্রকার বাধা, ধর-পাকড় করবে না এবং মিটিং মিছিলে কোন পক্ষ প্রতিপক্ষকে কোন বাধা প্রদান করবে না।

৩. যোগাযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আলোচনায় বসার দিন, তারিখ ও জায়গা ঠিক করা হবে।

কিন্তু সমঝোতা চুক্তির ১২ ঘন্টার পর প্রসিত চক্র সমিতির একজন সদস্য সুখেন্দু বিকাশ চাকমাকে খাগড়াছড়ির দাঁতকুপ্যা এলাকায় গুলি করে হত্যা করে। ফলে চুক্তি কাগজে লেখা ছাড়া বাস্তবে আর কিছুই হয়নি। প্রসিত চক্রের সমঝোতা চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সমঝোতার নামে পার্টির সদস্যদের খুন করা এবং সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা। যেভাবে করেছিল আশির দশকে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্ররা। তারাও সমঝোতার কথা বলে জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত এম এন লারমাকে '৮৩ সালের ১০ নভেম্বরে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর প্রসিত চক্র আবারো সমঝোতার প্রস্তাব দেয় যখন পার্টির সদস্য জীবন প্রদীপ দেওয়ানকে অপহরণ করেও স্থানীয় জনগণের চাপের মুখে হত্যা করতে পারেনি কিংবা টাকার বিনিময়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে ছাড়িয়ে আনেননি। তিন পার্বত্য জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রস্তাব

দেয় যে, জনসংহতি সমিতি যদি সমঝোতা বৈঠকে বসতে রাজী হয় তাহলে তারা জীবন প্রদীপ দেওয়ানকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবে। তিন পার্বত্য জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের আহ্বানে জনসংহতি সমিতি সাড়া দিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ সমঝোতা বৈঠকে বসতে রাজী হয়। সেই বৈঠকে জেএসএস এর পক্ষে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ান। অপরপক্ষে প্রসিত চক্রের পক্ষে ছিলেন সঞ্চয় চাকমা, অভিলাষ চাকমা ও অনিমেষ চাকমা। তিন পার্বত্য জেলা থেকে গৌতম দেওয়ান, মুথুরা লাল চাকমা, উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ অনেকেই ছিলেন। প্রসিত চক্রের পক্ষ থেকে সেই বৈঠকে আবারও প্রস্তাব দেয়া হয় যে, উভয়ের মধ্যে আক্রমণ না করা ও ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন করা। সেই বৈঠকে জেএসএস এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, প্রসিত চক্র যে সকল অস্ত্র দিয়ে চাঁদাবাজি, খুন, অপহরণ ইত্যাদি করে থাকে সে সকল অস্ত্র তৃতীয় কোন পক্ষের হাতে জমা দিতে হবে এবং জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সকল সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। এছাড়া জনসংহতি সমিতি যেহেতু চুক্তি করেছে চুক্তি বাস্তবায়নই হচ্ছে আমাদের আপাততঃ কর্মসূচী। কাজেই চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসলে সমঝোতা হতে পারে। কিন্তু প্রসিত চক্র কোন প্রস্তাবেই সাড়া দেয়নি। ফলে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেই বৈঠকের অপমৃত্যু ঘটে।

প্রসিতের অনেক অগুণের মধ্যেও কিছু কিছু গুণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো মানুষের দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা। তিনি এটা প্রয়োগ করে চলেছেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের জন্মের পর থেকে আজ অবধি। যে কথা আমি শুরুর দিকে বলেছি পিসিপি'র প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে প্রসিতকে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে চবি'র অনেক ছাত্রনেতৃবৃন্দের দ্বিমত ছিল। তারপরও বৃহত্তর ঐক্যের কথা ভেবে ধীরাজ চাকমা ও ধীমান চাকমারা তাকে অন্তর্ভূক্ত করে সদস্য হিসেবে। দ্বিতীয় কমিটিতে সে যখন ভালো কোন পদে যেতে পারলো না তখন দ্বিতীয় কমিটির অনেক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে গ্রুপিং করতে থাকলো। সে সময় কাজে লাগালো এডভোকেট শক্তিমান চাকমাসহ বেশ কয়েকজনকে। বিশেষ করে কাজে লাগিয়েছে জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তিকে। জনসংহতি সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ও এডভোকেট শক্তিমান চাকমাদের সহযোগিতায় তৃতীয় কমিটিতে প্রসিত সভাপতির পদটি দখল করে নেয়। তৃতীয় কমিটির মেয়াদ যখন শেষ প্রান্তে তার কিছু পকেট কর্মী দিয়ে প্রচার করলো সে আর কমিটিতে থাকছে না। এমনি কি গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও থাকবে না। অথচ ভিতরে ভিতরে করলো লবিং ও গ্রুপিং। ফলে কাউন্সিলে এসে সে আবার দখল করে নিলো সভাপতির পদটি। সে যখন বিদায় নিয়ে যাচ্ছে তখন সভাপতি হওয়ার কথা ছিল এডভোকেট শক্তিমান চাকমার। কিন্তু কাউন্সিলের ৩/৪ মাস আগে কোন একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে শক্তিমান চাকমার সাথে বিরোধ লেগে যায় তার। তখন তিনি কে এস মং মারমাকে সভাপতি করার প্রস্তাব দেয়। কে এস মং মারমা যেহেতু মারমা সমম্প্রদায়ের সেহেতু বৃহত্তর স্বার্থে শক্তিমান চাকমা তার জন্য সভাপতির পদটি ছেড়ে দেন। কে এস মং কমিটির সভাপতি হলেও খুব বেশী দিন কাজ করতে পারেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে অসহযোগিতা করা হয়েছে। ফলে তিনি দায়িত্ব নেয়ার কয়েক মাস পর পরই বান্দরবানে চলে যান। কেন্দ্রীয় দপ্তর ছেড়ে কেন বান্দরবানে অবস্থান করছেন-এই প্রশ্ন কে এস মং মারমাকে প্রতিনিধি সম্মেলনে করা হলে তিনি জবাব দেন, 'আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হয়েও আমি জানি না কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তগুলো কখন-কোথায় হয়, কিভাবে আসে?' অপরদিকে প্রসিত পিসিপি থেকে বিদায় নেয়ার পর পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রধীর তালুকদারকে কৌশলে সরিয়ে ঐ পদটি দখল করে নেয়। প্রসিতের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল প্রসিত যখনই সর্বোচ্চ পদে আসীন হন তখন অর্থ সম্পাদক পদটি দেবাশীষ চাকমা বাবলুকে দেন। ইউপিডিএফ গঠনের আগ পর্যন্ত প্রসিত পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদটি দখল করে রাখে এবং দেবাশীষ চাকমা আমেরিকা যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রসিতের অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

জনসংহতি সমিতির ঢাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য সমীরণ চাকমা প্রসিতের খপ্পরে পড়ে পাহাড়ী গণ পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের দিন প্রসিতের নির্দেশে তিনি বিবিসিতে এক স্বাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে বলেন, চুক্তি করে আমরা কিছুই পাইনি। অথচ '৯৮ এর ২৬ ডিসেম্বর যখন ৫ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ এর আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হলো সেই কমিটিতে তাকে অন্তর্ভূক্ত করা হলো না। প্রয়োজন শেষে এক পর্যায়ে তাকে সংগঠন থেকে দূরে সরে রাখা হলো। ফলে তিনি পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পার্টির সাথে হাত মেলায়। এভাবে অসংখ্য মানুষকে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য প্রসিত ব্যবহার করেছে এবং প্রয়োজন শেষে দূরে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে যারা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরকেও একদিন প্রসিত দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসিত বিকাশ খীসা একেবারে জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক নয় - একথা ঠিক নয়। তিনিও একসময় জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথিক ছিলেন। অনুরূপভাবে '৮৩ সালে গৃহযুদ্ধের মূল হোতা জুম্ম জাতির মহান নেতা এমএন লারমার হত্যাকারীরাও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তারাও জুম্ম জাতির মুক্তির জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম সে সময়ে শাসকগোষ্ঠীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে দেশ ও জাতির ক্ষতি সাধন করেছিল একথা কারো অজানা নয়। প্রসিত খীসার রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে বিশেষ করে ৯৭ থেকে আজ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক কার্যকলাপগুলি বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম জুম্ম জাতিকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণ তিল তিল করে বহু রক্ত, শ্রম ও মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে সংগ্রামী ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল প্রসিতের হঠকারী কার্যকলাপের জন্য তা আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার সেই জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খা জাতিকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতে চলেছে। প্রসিত খীসার এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রসিতের পক্ষ হয়ে যারা জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে তাদেরও বিষয়টা গভীরভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে বলে মনে করি।

গত ১ আগষ্ট ২০০১ ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিট থেকে একটা লিপলেট প্রকাশিত হয়। লিপলেটের হেডিং-এ লেখা ছিল - 'জেএসএস এর প্রতি আহ্বান - ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি নয়, আসুন জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হই'। লিপলেটের শেষে তারা লিখেছে - 'ইউপিডিএফ অতীতে জেএসএস এর কোন গণতান্ত্রিক কাজে বাঁধা দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না। ভিন্নমত সত্ত্বেও জেএসএস এর ডাকা হরতালে সমর্থন দিয়ে শুভেচ্ছার হাত প্রসারিত করেছে। আমরা আবারও ঘোষণা দিচ্ছি আমাদের পার্টি চুক্তি বাস্তবায়নে জেএসএস'কে সহায়তা দেবে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসুন আমরা যুগপৎভাবে আন্দোলন গড়ে তুলি।' প্রসিত চক্রের এই আহ্বান সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে খুবই চমৎকার। কারণ ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি কেউ চায় না। প্রকৃত অর্থে যারা জুম্ম জাতীয়তাবাদী এবং অধিকার প্রত্যাশী তারা সবাই চায় ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যারা অতীত সম্পর্কে খবর রাখে কিংবা প্রসিত চক্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও তাদের সম্পর্কে ভালো করে জানে তাদের কাছে এই আহ্বান হাস্যকর। এটা সহজ সরল জুম্মদেরকে প্রতারণা করার কৌশল ছাড়া কিছুই নয়।

প্রসিত চক্র শুরুতেই বলেছিল যে তারা অতীতে জেএসএস এর কোন গণতান্ত্রিক কাজে বাঁধা দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না - একথা সত্য নয়। তারা প্রতি পদে পদে জেএসএস এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে একটি হলো ১০ নভেম্বর ১৯৯৮ যখন জেএসএস এম এন লারমার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী কেন্দ্রীয়ভাবে খাগড়াছড়িতে পালন করে। সেই কর্মসূচীতে বিভিন্ন জায়গা থেকে জেএসএস কর্মী-সমর্থকরা আসার পথে প্রসিত চক্র কর্তৃক বাধাগ্রস্থ হয়। প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা সেদিন বিজিতলা নামক জায়গায় সকাল বেলা এম এন লারমার ছবি ভাংচুর ও পুড়িয়ে ফেলে এবং মহালছড়ি থেকে অনুষ্ঠানে আসা একটি বাস সেখানে আটকে রাখে। অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যার দিকে কর্মীদের বহনকারী ১০টি বাস মহালছড়ি ফেরত যাওয়ার পথে বিজিতলায় প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালায়। সেখানে জনসংহতি সমিতির জীবন প্রদীপ দেওয়ান, ইরান কুমার চাকমাসহ ২০ জন সদস্য-সমর্থক গুরুতর আহত হন এবং বাসগুলো ভাংচুর করা হয়।

তারা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দাবী করলেও বাস্তবিক অর্থে তারা গণতান্ত্রিক নয়। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক আচরণ করে চলেছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা চুক্তির পর পরই যখন অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে তখন তাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে, জুতা দেখিয়ে হেনস্থা করে। তারা জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও জুম্ম জনগণের পরীক্ষিত নেতা সন্তু লারমার মাথায় শিং এঁকে দিয়ে পোষ্টার ছাপায় ও দেওয়াল লিখন করে অসুস্থ ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। দীর্ঘ আড়াই

দশক ধরে কঠোর কঠিন পরিশ্রম করে জীবন বাজী রেখে যারা জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিল এবং একটা চুক্তির মধ্য দিয়ে অধিকারের সনদ নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল তাদেরকে এভাবে হেনস্থা করা কোন দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক মানুষের আচরণ বা কাজ হতে পারে না।

তাদের প্রচারপত্রে 'ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও জেএসএস এর ডাকা হরতালে সমর্থন দিয়ে শুভেচ্ছার হাত প্রসারিত করেছে' বলে তারা যেটা উল্লেখ করেছিল সেটা আংশিক সত্য মাত্র। জেএসএস যখন তৎকালীন টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান ও উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবীতে হরতাল আহ্বান করেছিল সেই হরতালে প্রসিত স্রেফ একটা বিবৃতি দিয়ে সেই হরতালকে সমর্থন জানায়। সেখান থেকে বেশী দূর যায়নি তাদের শুভেচ্ছার হাত। হরতালের সমর্থনে কোথাও তারা পিকেটিং কিংবা সভা করেনি।

২০০১ সালের ১ আগষ্টে এসে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে চুক্তি কতটুকু বাস্তবায়িত হবে কিংবা জুম্ম জনগণ কতটুকু অধিকার লাভ করবে? ইতিমধ্যেই ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। সরকারের সাথে বৈঠকের সময় বৈঠকের বিরোধীতা করার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণকে যে ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়েছে তা আর পূরণ হবার কথা নয়। আজ পর্যন্ত ৪১ জন জেএসএস সদস্য-সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীকে খুন করা হয়েছে, ৩০০ জনের অধিক অপহরণ করে গুম করা হয়েছে, ২৫০ জনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, ৫০০ জনের অধিক লোককে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে মুক্তিপণ আদায়, ঘরবাড়ী লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে।

৩ জন বিদেশীকে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে অপহরণ করার মধ্য দিয়ে বিদেশী সংস্থা কর্তৃক সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই অপহরণের মাধ্যমে প্রসিত চক্র কর্তৃক সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করার একটা সুযোগ ও ভিত্তি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। ফলে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করা হয়েছে চুক্তি বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি করে জুম্ম জনগণকে বিভক্ত করার মাধ্যমে। গোটা পার্বত্য এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস, হানাহানি ও চাঁদাবাজীর মাধ্যমে আন্দোলন সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে। চুক্তির বিরোধিতা করে চুক্তি পক্ষের লোকজনকে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করা হয়েছে চুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য। ফলে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তির মৌলিক দিকগুলো বাস্তবায়ন না করে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে। বর্তমানে বিএনপি'র নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট সরকার চুক্তি কতটুকু যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বাস্তবিক অর্থে আমরা যদি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে যে কোন সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য, অন্যথায় নয়।

তারপরও আমরা জুম্ম জনগণ আশ্বস্থ হতে পারতাম যদি প্রসিত চক্র তাদের ১ আগষ্ট তারিখের প্রচারপত্রে যা লিখেছে তা পালন করতো। আমার মনে হয় তারা যা বলে এবং লেখে বাস্তবে তার উল্টোটাই করে। তারা যা লিখেছে তা বাস্তবায়ন করলেও আমরা অন্ততঃ ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি দেখতাম না, দেখতাম না কাউকে নির্মমভাবে খুন, অপহরণ হতে এবং অপহৃত হয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া পেতে। দেখতে পেতাম সকল জুম্ম জনগণ চুক্তি বাস্তবায়ন তথা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে। তাদের এই বিবৃতির পরও আমরা শুনেছি, দেখেছি জনসংহতি সমিতির

অনেক অনেক নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের অপহরণ করতে, রাতের অন্ধকারে খুন হতে। তাদের এই বিবৃতির পর অনেকগুলোর ঘটনার মধ্যে দু'টো ঘটনার বিবরণ দেবো।

এক.

গত ১৮ অক্টোবর ২০০১ তারিখে প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা মহালছড়ি থানার মুবাছড়ির খুলারাম পাড়ায় যায়। সেখান থেকে তারা ৫ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনজনকে ছেড়ে দিলেও বাকী ২ জনের মধ্যে আইনষ্টাইন চাকমার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ তাকে খুন করা হয়েছে। অপর একজন হলেন প্রসিতের আপন চাচাতো ও খালাতো ভাই বাপ্পী খীসা অর্থাৎ প্রসিত ও বাপ্পীর বাবারা আপন ভাই এবং উভয়ের মা আপন বোন। অথচ বাপ্পীকে প্রসিত চক্রের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে মুক্তিপণ দিতে হয়েছে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। সন্ত্রাসীদের নেতা অভিলাষ চাকমা খাগড়াছড়ির পেরাছড়া এলাকায় সেই টাকা গ্রহণ করে বাপ্পী খীসাকে মুক্তি দেয়। বাপ্পী জনসংহতি সমিতির কোন নেতা বা কর্মী ছিলেন না। তারপরও তাকে কেন অপহরণ করার পর মুক্তিপণ আদায় করা হলো - এই প্রশ্ন সবার, ব্যক্তিগতভাবে আমারও। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি পারিবারিক শত্রুতাকে কাজে লাগিয়েছে প্রসিত। প্রসিতের দাদী খুলারাম পাড়ায় মৃত্যুবরণ করেন কয়েক বছর আগে প্রসিতের এক চাচার বাসায়। সেই সময়ে প্রসিতের সেই চাচা ছিলেন সমাজচ্যুত। সামাজিক অপরাধ করার কারণে গ্রামের কেউ তার বাসায় যেতো না। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে প্রসিতের বাবা গ্রামের বাড়ী গিয়ে দেখতে পান তার মায়ের মৃতদেহ ছোট ভাইয়ের বাসায় গ্রামের লোকজন ছাড়া পড়ে রয়েছে। গ্রামের কেউ সেখানে নেই। দাহ করারও কোন আয়োজন নেই। প্রসিতের বাবা অনন্ত বিহারী গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বীকে ডেকে পাঠালেন তার কাছে যাওয়ার জন্য। তারপরও কেউ গেলো না। পরে তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে সবার কাছ থেকে ক্ষমা চাইলেন এবং অনুরোধ করলেন অন্ততঃ মায়ের মৃতদেহটা যেন সৎকার করা হয়। তখন গ্রামবাসী সবাই মিলে মৃতদেহকে সৎকার করলো। অনন্ত বিহারী খীসা নিজেকে অনেক পন্ডিত এবং সম্মানী মানুষ হিসেবে ভাবতেন। গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাওয়াটা অপমান হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি কোন মতেই তা মেনে নিতে পারেননি। সেই ঘটনার জন্য তার আরেক ভাইয়ের ছেলে প্রজ্ঞান খীসা ও বাপ্পী খীসাকে দায়ী করতেন। তাদের কারণে গ্রামবাসীদের কাছে মাথানত করতে হয়েছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। অনুরূপভাবে প্রসিতও তার বাবার সেই অপমানিত হওয়ার ঘটনা সহজেই মানতে পারেনি। তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়। উল্লেখ্য যে, বাপ্পীকে অপহরণ করার পর তার মা অনন্ত বিহারী খীসার বাসায় যান ছেলের মুক্তির ব্যাপারে। তখন অনন্ত বিহারী খীসা তাকে বলেন - 'এটা ছেলেদের ব্যাপার, আমি কিছুই জানি না এবং কিছুই করতে পারবো না'। অথচ খাগড়াছড়ির সবাই জানে অনন্ত বিহারী খীসা প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতা এবং অন্যতম উপদেষ্টা। সেই সময় প্রসিত চক্র অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীতে ইউপিডিএফের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে সন্ত্রাসীদের আস্তানা গড়েছে।

দুই.

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে একদল চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু থানার তিনটিলা গ্রামে রাত আনুমানিক ৯টার দিকে দেব বিকাশ চাকমাকে (সুবীর ওস্তাদ) দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে গুলি করে হত্যা করে। শহীদ দেব বিকাশ চাকমা জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে তাঁর বয়স যখন পনর কি ষোল বছর তখন জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেন। দীর্ঘ দুই দশকের বেশী সময় ধরে সশস্ত্র সংগ্রামে অমূল্য অবদান রেখেছেন। তিনি জীবন বাজী রেখে শত্রুবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করে অনেক অনেক অস্ত্র-গোলাবারুদ ছিনিয়ে এনেছেন এবং শত্রু শিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। সেই সময়ে তাঁর নাম শুনলেই শত্রু শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। অপরদিকে নতুন ভর্তি হওয়া সদস্যদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। অথচ সেদিন সন্ত্রাসীরা রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে। সেদিন সন্ত্রাসীদের বুলেটের আঘাতে দেব বিকাশ চাকমা শহীদ হলেন। অসময়ে অসহায়ভাবে ফেলে যেতে বাধ্য হলেন নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী ও অবুঝ চার সন্তানকে। তাঁর চার সন্তানের মধ্যে তিনজনই মেয়ে, একটি মাত্র ছেলে - যার বয়স এখনো দুই মাস। বড় মেয়ে মঞ্জু অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, দ্বিতীয় মেয়ে মহতী চতুর্থ শ্রেণীতে, তৃতীয় মেয়ের বয়স চার বছর।

২৫ ডিসেম্বর ২০০১ ইং দেব বিকাশ চাকমার অন্তেষ্টিক্রিয়ায় রাঙ্গামাটি থেকে জেএসএস এর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে উষাতন তালুকদার ও চন্দ্রশেখর চাকমাসহ ১৬ জনের একটি প্রতিনিধিদল লংগদুতে যান। তাদের সাথে আমিও ছিলাম বীর শহীদ সুবীর ওস্তাদকে সর্বশেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। দেব বিকাশ চাকমার মৃতদেহ শ্মশানে নেয়ার সাথে সাথে আমরাও তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম, শ্মশান থেকে সরাসরি রাঙ্গামাটি ফিরে আসবো বলে। শহীদ দেব বিকাশের স্ত্রী উষাতন তালুকদার, চন্দ্রশেখর চাকমাদের প্রণাম করার পর আমাকে প্রণাম করতে চাইলেন। আমি বাঁধা দিয়ে বললাম আমাকে নয়। তিনি স্বামী হারানোর শোকে এতটা চোখের জল ফেলে চলেছেন যে বুঝতে পারছেন না, কাকে কাকে প্রণাম করতে হবে। ভবিষ্যত অন্ধকার দেখছিলেন তিনি এই দুনিয়ায় চার অবুঝ সন্তানকে নিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকবেন, কিভাবে চলবে তার সংসার? ছেলেমেয়েদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার খরচ পাবেন কোথায়? দুই মাস বয়সের ছেলে কথা বলতে শিখে যখন বাবাকে খুঁজবে কি জবাব দেবেন তিনি। কেন তার বাবাকে হত্যা করা হলো? তিনি নিশ্চয় জবাব দেবেন তোমার বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দীর্ঘ দুই দশকের বেশী সময় ধবে মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের কৌশল শিখিয়েছেন অনেককে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তির মাধ্যমে অধিকার নিয়ে ফিরে এসেছেন বলে একদল সন্ত্রাসী হায়েনার মতো হিংস্র হয়ে রাতের অন্ধকারে তোমার বাবাকে খুন করেছে।

ছেলেটি যখন বড় হয়ে সমাজের কাছে জানতে চাইবে তার বাবার কি অপরাধ ছিল? কি জবাব দেবে সমাজ? প্রসিত খীসা ও সঞ্চয় গংরাই বা কি জবাব দেবে?

স্বপ্নভঙ্গ

সুদীর্ঘ চাকমা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। অনেকেই তাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম আনন্দের বার্তা পাঠায়। কিন্তু সবচে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল তারাই যারা রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে অপরিসীম ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করতে লড়েছিল অগ্নিযুগের সেই বীর সন্তানেরা আর এদেশের মানুষ। তাদের অনুভূতি উল্লাস ছিল সেই অভিনন্দন জানানো নেতৃবৃন্দ এর চেয়ে অনেক বেশী। তারা চোখভরা স্বপ্ন ও বুকভরা আশায় বুক বেঁধেছিল সেদিন, তাদের স্বপ্নের স্বাধীন দেশে শোষণ ও নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবে না কেউ। ছাত্ররা পড়তে পারবে, বেকাররা চাকুরী পাবে। স্বাধীন দেশে সবাই মাথাউচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে। তাদের স্বপ্নের আশার প্রতিফলন বিগত ৩০ বছরে ঘটেনি। স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে স্বাধীন মানুষের। নুতন করে পরাধীনতার শিকলে বন্দী হয়েছে গরীব মেহনতি মানুষ।

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যেকার স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি।' পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে চুক্তি হয়েছে বিধায় "শান্তিচুক্তি" নামে বেশী পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা, নেতৃবৃন্দ অভিনন্দন ও স্বাগত জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্মদের প্রেক্ষাপটে এই চুক্তি স্বাক্ষর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। জুম্মদের বিগত ইতিহাসে চুক্তির মধ্যে দিয়ে অর্জিত অধিকার কখনো অর্জিত হয়নি। বরং জুম্মদের পেছনের ইতিহাস বঞ্চনা ও যাতনার ইতিহাস। স্বভাবতই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে জুম্মদের আনন্দের মাত্রা অন্যান্য দেশের, সংস্থার, নেতৃবৃন্দের চাইতে অবশ্যই বেশী ছিল। জুম্মদের আশা জেগেছিল পৃথিবীর বুকে নুতন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে জীবন গড়ার। সুখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল বাপ-দাদার ভিটে মাটি হারানো নব প্রজন্মের রাধামন-ধনপুদিরা। ইতিহাসের কথা শুনিয়ে যাবে তাদের গানে, দাদা-দাদীদের পজ্জনে যুক্ত হবে এই ঐতিহাসিক ঘটনা, পূর্ণিমার রাতে জুম ঘরের ইজোরে বসে রেইংএর পর রেইং দিয়ে যাবে পাহাড়ী যুবক। বিগত দিনের পিশাচের আঘাতে গলাকাটা বুদ্ধমূর্তি জোড়া লাগিয়ে কিয়ং-এ যাবে ধর্মপ্রাণ দায়ক দায়িকা, নিজ জমি ফিরে পেয়ে ফসল ফলিয়ে মালেয়্যে ডেকে ঘরে ফসল তুলবে জুম চাষী কৃষক। আর কত কি স্বপ্ন, ইচ্ছা, কামনা!

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অত্রাঞ্চলের মানুষের এতটাই প্রভাব পড়েছে যে, চুক্তি স্বাক্ষরের সমসাময়িক সময়ে জন্ম নেয়া নবজাতকের নাম "চুক্তি" "শান্তি" রেখেছে। খাগড়াছড়িতে চুক্তি পরবর্তী সময়ে বিরতিহীন সার্ভিস "শান্তি এক্সপ্রেস" চালু হয়েছে। দু পক্ষের বিবাদ মীমাংসা হলে লোকে শান্তিচুক্তি নামে অভিহিত করেছে ইত্যাদি। আরো কত কি!

এত আনন্দ, প্রত্যাশা, উচ্ছাস তারপরও চুক্তি স্বাক্ষরের এক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই পার্বত্য মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হলো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক রাঙামাটিতে পাহাড়ী গ্রামে হামলা, ১৩ জানুয়ারী'৯৮ এর বিডিআর এর গুলিতে স্কুল ছাত্র ইরেন চাকমা রন্টুর মৃত্যু। ইরেন ছিলো রাঙামাটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র। যে হতে চেয়েছিল সুদক্ষ কারিগর। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর এক সুদক্ষ কারিগরের নির্মিত বুলেটে তার জীবন দিতে হলো। রাঙামাটির বরকল থানাধীন ভূষণছড়া ইউনিয়নের এক বৃদ্ধের অভিব্যক্তি আজও আমার মনে পড়ে। উনি গিয়েছিলেন দীপংকর তালুকদারের হরিণাবাজারে আয়োজিত জনসভায়। দীপংকর তালুকদার বহিরাগত বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পুনর্বাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করলে তিনি ক্ষোভে-দুঃখে বলেন- "আমার জমির আম গাছের আম আমাকে কিনে খেতে হচ্ছে নগদ টাকায় বহিরাগতদের কাছ থেকে। আমার সবকিছু এখন তাদের, এমনকি জীবনও। এ দুঃখ দীপংকরবাবু উপলব্দি করতে পারলেন না।" দীঘিনালার বাবুছড়া বাজারে, মাটিরাঙ্গায় এখনও সেনা নিগৃহ হতে আমাদের মা-বোনেরা মুক্ত নয়। হাটে-বাজারে জুম্মরা নিরাপদ নয়। প্রতিনিয়ত চলছে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ। জুম্মদের সংস্কৃতি, অস্তিত্ব আজ হুমকীর সম্মুখীন।

চুক্তির ফলে শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীরা ভ্রাতৃঘাতী সহিংসতায় মরে। মৃত্যু তাদের পুরষ্কার। শত্রুর কাজসমূহ আমাদের একটি অংশ করে দিচ্ছে। চুক্তির ফলশ্রুতিতে বিদেশীদের আনাগোনা। পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা উন্নয়ন করতে চায়। তাদের উন্নয়নের এমন নজির আছে তা জানলে গা শিউরে উঠে। দেশী বিদেশী এনজিও তৎপরতায় পার্বত্যবাসী ঋণের জালে দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে। দেশী-বিদেশী পর্যটক রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ঘুরতে এসে তারা মুগ্ধ হন। কাপ্তাই হ্রদ, মেঘলা, আলুটিলা, ফুরামোন, তাজিংদং তাদের নজর কাড়ে। নজর কাড়তে পারি না আমরা, যাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য প্রত্যেকটি সরকার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আমাদের চোখের জলে ভরে উঠা কাপ্তাই হ্রদের জলে পর্যটকরা স্নান করেন, সাঁতার শিখতে আসেন কেউ কেউ। দু'তিনশত ফুট উঁচু পাহাড়ের কোল বেয়ে পানির কলসী নিয়ে হেঁটে যাওয়া জুম্ম নারী ক্যালেন্ডারে মানায় ভালো, দেখতেও বেশ। শুধু মানায় না জুম্ম নারীর কষ্টকর জীবনের সাথে।

পাহাড়ীরা ছিল সহজ সরল। তাদের কোন লিখিত চুক্তি ছিল না; নেই তাদের ভিটে মাটির দলিলপত্রও। যেখানে তারা বেড়ে উঠেছে সেটা তাদের ঠিকানা। ধারের টাকা তারা লিখে রাখে না। তা নিয়ে কোন সমস্যাও হতো না। সবই বিশ্বাস। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব যেখানে চরম সেখানে চুক্তি (লিখিত) আবশ্যকীয়। সে কারণে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। সরকার পার্বত্যবাসীর সাথে বেঈমানী ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। এ লঙ্ঘন প্রক্রিয়ার সাথে যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছেন জুম্ম হলেও পার্বত্যবাসী তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। যাত্রার রঙ্গমঞ্চ হতে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। সে জায়গায় অভিষেক ঘটবে, ঘটেছে নতুনদের। তারাও যদি

পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে ইতিহাসের পাতায় মীর জাফরের মতো খল নায়ক হয়ে থাকবে।

কত ত্যাগ, কত মানুষের রক্ত, জীবন, কত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছিল এই বাংলাদেশ। স্বাধীন দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ অধিকার আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তাই দেশব্যাপী চলছে সংগ্রাম। সে সংগ্রাম যতই ক্ষুদ্র হোক তা একদিন বেড়ে গিয়ে শাসকের পদমূলে আঘাত হানবে। আঘাতে চুরমার হবে শোষকের কালো হাত। একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যেভাবে জ্বালিয়ে দেয় সমগ্রকে। তেমনিভাবে ঐতিহাসিক "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" বাস্তবায়নেও জনগণের সর্বাত্মক আঘাতের বিকল্প নেই।

জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অবস্থান ও পার্বত্য চুক্তি

(৬ পৃষ্ঠার পর)

সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে যারা ক্ষুদে জাতিগোষ্ঠী নিয়ে ভাবতে পছন্দ করে তাদের ভূমিকাটা সবচাইতে ক্ষতিকারক। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্র জুম্ম জনগণের ঐক্য সংহতিকে আঘাত করেছে এবং জাতির অধিকার আদায়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করেছে। আজও দেখা যায় শাসকশ্রেণী জুম্ম জনগণের একটা উদভ্রান্ত অংশকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়নকে ধামাচাপা দিতে চাইছে।

শাসকশ্রেণী জানেন এই পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ যত জনগণ আছেন তাদের বিরাট অংশটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়। আরও একটা অংশ আছে যারা কিছু সুবিধা পেলে সবকিছু ভুলে যায় এবং শাসকগোষ্ঠীর সেবাদাসে পরিণত হয়। কিছু কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা বরাবরই অধিকারের কথা বলে থাকে। বিগত সরকার নানাভাবে জেএসএস নেতৃত্বকে বশীভূত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয় তখনই নব্য বিভেদপন্থী চক্র প্রসিত-সঞ্চয় গংদের হাত করে নিয়ে এই দুর্ধর্ষ জেএসএস নেতৃত্বকে আঘাত হানতে শুরু করে যাতে জেএসএস তার দাবী থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

বর্তমানে জোট সরকাব ক্ষমতায় আসার আগে চুক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেও ইদানীং আপাততঃ কিছুই বলছে না। এই কিছু না বলার মধ্যেও অর্থ আছে। একসময় মনে করা হতো পার্বত্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি। আওয়ামী লীগও ভাবতো জেএসএস যতই বিরোধীতা করুক না কেন তাদের দুর্গে কেউ কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু বিগত সংসদ নির্বাচনে জেএসএস এর নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের ঐক্যশক্তি এমনভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ যেমনি হতচকিত হয়েছে তেমনি বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারও বিস্মিত হয়েছে। তাই বর্তমান সরকার হুট করে তেমন কিছু বলতে চাচ্ছে না। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত শাসকশ্রেণীর লোকজন কখনও চুপচাপ বসে নেই। তারা সবচাইতে বেশী মদত দিচ্ছে প্রসিত সঞ্চয় গংদের। এই প্রসিত-সঞ্চয় গং তাদের নাশকতামুলক কাজের মাধ্যমে যদি জেএসএস নেতৃত্বকে কাবু করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে তাহলে এই সরকার আবার সদম্ভে ঘোষণা করবে এই পার্বত্য চুক্তি-'কালোচুক্তি'। 'এই চুক্তি তারা মানে না।' সুতরাং বাস্তবায়নের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু জুম্ম জনগণের সচেতন অংশটি সেটা হতে দিচ্ছে না, দিতে পারে না। এই চুক্তি বাস্তবায়নে জুম্ম জনগণের ব্যাপক অংশটি যতই সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠবে ততই সোচ্চার কণ্ঠে শ্লোগান উঠবে - 'পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

(৮ পৃষ্ঠার পর)

রাতারাতি টিনের ছাউনি দিয়ে দেড় শতাধিক ঘর নির্মাণ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য সরকারের বিশেষ গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ হাত না থাকলে এ রকম সংঘবদ্ধ কাজ কখনোই ঘটতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ১২ এপ্রিল ২০০১ সেটেলারদের উচ্ছেদের নোটিশ দেয়। কিন্তু তারা সরে গিয়ে আরো নতুন জায়গা দখল ও দখলীকৃত জায়গায় ঘরবাড়ী নির্মাণ অব্যাহত রাখে। ১ জুলাই ২০০১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটির সভায়ও সিদ্ধান্ত হয় সম্প্রসারিত গুচ্ছগ্রাম গুটিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু অদ্যবধি তারা বহাল তবিয়তে আছে এবং গত ২৪ নভেম্বর আরো নতুন জায়গা দখল করতে গেলে এবং এতে পাহাড়ীরা বাধা দিলে সেটেলাররা পাহাড়ীদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ইউপি চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমাসহ ২০ জন আহত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে এবং উদ্বেগজনক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলারসহ বহিরাগতদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান হারে বহিরাগত লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করছে এবং তারা অব্যাহতভাবে ভূমি বেদখল করে চলেছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সাথে স্বৈরাচারী শাসনামলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের বিষয়টি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এসব সেটেলাররা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরই শিকার। তাদের দারিদ্রতা ও নদী ভাঙ্গনের ফলে ভাসমান জীবনের অসহায়ত্বকে ব্ল্যাক মেইল করে তৎকালীন স্বৈরশাসক নানা প্রলোভন দেখিয়ে সেনাবাহিনীর মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। এই ছিন্নমূল অসহায় মানুষদেরকে স্ব স্ব জেলায় সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত সমাধান কঠিন হবে।

দীঘিনালায় সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখলের পায়তারা

খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা থানার ৫৩ নং কবাখালী মৌজায় দেড় শতাধিক বহিরাগত সেটেলার পাহাড়ীদের ভূমি বেদখরের জন্য অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত সময়ে সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে তারা জুম্মদের ভূমি বেদখল করে দীঘিনালা এলাকায় এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে। সম্প্রতি তারা নতুন করে জুম্মদের জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে গৃহ নির্মাণ করে ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাহাড়ীদের বন্দোবস্তী ও দখলীকৃত জমি বন্দোবস্তীর জন্য সেটেলাররা খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বন্দোবস্তী মামলা দায়ের করেছে। এহেন অবস্থায় পাহাড়ীদের জমির উপর সেটেলারদের দাখিলকৃত বন্দোবস্তী মামলা বাতিল ও গৃহ নির্মাণ বন্ধ করার জন্য বিগত ৫ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে ৫৩ নং কবাখালী মৌজার হেডম্যান দীপংকর দেওয়ান খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করেন। উক্ত দরখাস্তে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে ১৯৮৬ ইং হতে ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত পাহাড়ীরা ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেই সুযোগে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক সেটেলাররা পুনর্বাসনের জন্য উক্ত মৌজায় ভূমি বন্দোবস্তী চাইলে তিনি যদিও তাদের স্বপক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন কিন্তু মুলতঃ তাকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিল করাতে বাধ্য করা হয়। ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ তারিখে দীঘিনালার সহকারী ভূমি কমিশনার এর স্বাক্ষরিত স্মারক নং ৩৫/৯২-২৯/রাজস্ব মূলে দীপংকর দেওয়ান এর কাছ থেকে বাবুছড়া এলাকার ৬৪টি সেটেলার পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য প্রতিবেদন লেখার জন্য সীল মোহরসহ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। শুধু তাই নয় ৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে স্বয়ং দীঘিনালা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার স্মারক নং ২১৮/রাজস্ব চিঠিমূলেও ১৪৭টি অউপজাতীয় পরিবারের অনুকুলে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তার অফিসে হাজির হবার নির্দেশ দেয়া হয়।

বহিরাগত সেটেলাররা সেই এলাকায় কেবলমাত্র ভূমি বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করে ক্ষান্ত হননি তারা সম্প্রতি সেখানে অবৈধভাবে আবারও জঙ্গল পরিষ্কার করে গৃহ নির্মাণ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই উপরোক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে বর্ণিত জায়গায় সেটেলারদের জঙ্গল কাটা ও গৃহ নির্মাণ স্থগিতাদেশসহ বন্দোবস্তী মামলা বাতিল করার জন্য উল্লেখিত দরখাস্তে হেডম্যান দীপংকর দেওয়ান আবেদন করেন।

এছাড়া উক্ত মৌজার ৪ জন কার্বারী যথাক্রমে শান্তি বিকাশ কার্বারী, বিমল চন্দ্র কার্বারী, প্রমোদ বিকাশ কার্বারী ও অনিল বিকাশ কার্বারী সেটেলারদের কর্তৃক গৃহনির্মাণ বন্ধ রাখার জন্য জেলা প্রশাসকের বরাবরে আবেদন জানান। কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলতঃ অত্র এলাকায় বহিরাগত সেটেলারদের দ্বারা ভূমি বেদখল অব্যাহত থাকায় এবং এতে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদ থাকায় এলাকার জুম্মরা উদ্বেগের মধ্যে বিরাজ করছে।

লংগদুতে ভূমি বেদখল অব্যাহত

রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলায় বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক স্থানীয় সিভিল ও সেনা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে জুম্মদের ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে। স্বৈরশাসক এরশাদ ও জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কয়েক হাজার বহিরাগত বাঙালি সরকারী উদ্যোগে লংগদুতে পুনর্বাসনের নামে জুম্মদের ভূমি বেদখল করে এবং জুম্মদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে। ১৯৮৯ সালে লংগদু গণহত্যায় কয়েকশত পাহাড়ীকে হত্যা করা হয় এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে জুম্মদের সম্পত্তি দখল করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে জুম্মদের ভূমি ফেরৎ দানের উল্লেখ থাকলেও তার সুফল এখনো পাওয়া যায়নি ল্যান্ড কমিশনের কাজ শুরু না হওয়ার কারণে। উপরন্তু এ সুযোগে বহিরাগত বাঙালিরা লংগদু উপজেলাধীন ২৫নং সোনাই মৌজায় দীনমনি চাকমা পীং মৃত গোলক চন্দ্র চাকমা সাং সোনাই এর ৫একর রেকর্ডীয় জায়গা হোল্ডিং নং-২১/৮৫ ও ৫নং চাইল্যাতলী মৌজার জুম্মদের রেকর্ডীয় জমি বহিরাগত সেটেলার কর্তৃক বেদখল অব্যাহত রয়েছে।

১১নং পেদান্যাছড়া মৌজার তড়িৎ কান্তি কার্বারী পীং মৃত সুষমা রঞ্জন কার্বারীর হোল্ডিং নং আর-৫/৩২ জায়গার উপর দিদার রহমান পিং- জলিল সওদাগর, গ্রাম মহাজন পাড়া এর নেতৃত্বে একদল সেটেলার আশ্রায়ণ প্রকল্পের নামে ভূমি বেদখল করেছে।
সেনা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে বারবার লিখিত আবেদন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ অবস্থায় বর্তমানে জুম্মরা আরো ভূমি বেদখল হবার আশংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

বন বিভাগ কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

নানা কলা-কৌশলে জায়গা-জমি বেদখল করে জুম্মদের উচ্ছেদ ও ভিটেমাটি ছাড়া করার ষড়যন্ত্র সমানে চলছে সরকারী ও বেসরকারীভাবে। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় একাধারে বহিরাগত সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখল করা হচ্ছে। পাশাপাশি বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বন সৃজনের নামে জুম্মদের জায়গা-জমি দখল করে নিচ্ছে। রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার ৩২০নং কাকড়াছড়ি মৌজায় ৩০০ একর, ৩৩৪নং কুক্যাছড়ি মৌজায় ৬২৭ একর এবং ৩৩২নং জিমরাম মৌজায় ১,২২২ একর ভূমির উপর বন বিভাগ সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এসব জায়গা-জমিতে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীগণ বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে জুমচাষসহ বিভিন্ন খাদ্য শস্য চাষ, ফল বাগান ও বন বাগান সৃষ্টি করে ভোগদখল করে আসছে। অনেকের সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এসব জমির বন্দোবস্তী মামলাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব এলাকায় সংখ্যালঘু খিয়াং ও তঞ্চঙ্গ্যাসহ ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রায় চৌদ্দ শত লোক বসবাস করছে। তারা এসব জায়গা-জমি প্রথাগত ভূমি মালিকানা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে ভাগ-বন্টন করে কোনরূপ

(৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিশেষ প্রতিবেদন

শতগুণ বৃদ্ধি করে দীঘিনালায় জলেভাসা জমির রাজস্ব আদায়

অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার রাজস্ব কর্মকর্তা অরবিন্দু মজুমদার কর্তৃক কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ২৮নং রেংকার্য্যা মৌজা, ২৯নং ছোট মেরুং মৌজা, ৩০নং বড় মেরুং মৌজা, ৫৪নং তারাবন্যা মৌজা এবং ৫৫নং ছোট হাজাছড়া মৌজার জলেভাসা জমি থেকে একর প্রতি ৩ (তিন) টাকার স্থলে ৩০০ (তিন শত) টাকা ধার্য করে ভূমি রাজস্ব এবং বন্দোবস্তীর ক্ষেত্রে একর প্রতি ৩০০ (তিন শত) টাকা হারে সালামী আদায় করা হচ্ছে। সরকারী কর্মকর্তার এহেন অবৈধ ও স্বৈরচারী কর্মকান্ডে এলাকাবাসী ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। উক্ত ৫ মৌজার হেডম্যানগণ এই অবৈধ ও স্বৈরচারী কায়দায় রাজস্ব নির্ধারণের প্রেক্ষিতে প্রতিবিধান চেয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত প্রদান করেছে। কিন্তু আজ অবধি দীঘিনালা উপজেলার রাজস্ব কর্মকর্তার উক্ত কার্যক্রম বন্ধ করা হয়নি।

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক ষ্টান্ডিং অর্ডার 848(140)/sett. D. Rangamati 20/06/1966 মূলে এসকল জলেভাসা জমি চাষাবাদের জন্য একসনা ভিত্তিতে মূল মালিকদের নিকট বন্দোবস্তী দেয়া হয়ে আসছে এবং প্রত্যেক বছর মূল মালিকরা বন্দোবস্তী নবায়নের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ দখল করে আসছে। উক্ত ষ্টান্ডিং অর্ডার-এ বলা হয়েছে যে, "The plough lands falling below 120 M.S.L. in the Kaptai Reservoir area for which compensation was paid and which are now available for sessional cultivation would be leased out temporarily to the local people with the express condition that these will be treated as fringe land... The leasee will pay rent on these lands as usual.... These lands will be leased out to the original R. Ts. provided they have got no land else where from Rehabilitation Department and that they are still residing in the same mouza without shifting to any new place of rehabilitation. In case the original tenants have shifted to their places of Rehabilitation in non-submergance areas or they have got allotment of lands against their 'B' Forms through the Rehabilitation Department; the other residents of the mouza should get lease of such lands... The Sub-Divisional Officers may receive petitions for such settlement through the Headmen concerned."

তৎসময়ে পর্যাপ্ত জমির অভাবে উল্লেখিত মৌজার জমি মালিকদেরকে 'বি' ফরমে জমি বন্দোবস্তী দেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় তারা বাস্তুভিটা বা মৌজা ত্যাগ করেনি। উল্লেখিত আদেশ বলে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যানের মাধ্যমে তারা স্ব স্ব জলেভাসা জমি একসনা বন্দোবস্তী গ্রহণ ও বছর বছর সরকারের রাজস্ব দাখিল করে নিজ জমি ভোগ দখল করে আসছে। এছাড়া ষ্টান্ডিং অর্ডার মোতাবেক এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট হেডম্যানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ও একসনা বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ নিয়মকে লঙ্ঘন করে বর্তমানে রাজস্ব কর্মকর্তা সরাসরি রাজস্ব আদায় করে চলেছে। গত বছর জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভূমি সহকারী কমিশনারের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় জমির মালিকদের কাছ থেকে রাজস্ব বাবদ একর প্রতি ৫০ টাকা ও ৩০০ টাকা এবং নবায়ন ফিস ৫০ টাকা আদায়, হেডম্যানের পরিবর্তে ডি এস আর বই মারফত ভূমি সহকারী কমিশনার কর্তৃক আদায় করা এবং প্রতি পরিবারে গড়ে ২ (দুই) একর করে জমি বন্টন ও বিতরণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে অবৈধ এবং উল্লেখিত ষ্টান্ডিং অর্ডারের বরখেলাপ। উক্ত ষ্টান্ডিং অর্ডারে জমির রাজস্ব পূর্ব নির্ধারিত প্রচলিত হারে দিতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্কেল চীফ ও মৌজা হেডম্যানদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৩ টাকা হারে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। সেখানে খাগড়াছড়ি জেলায় একতরফা ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে শতগুণ বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা নির্ধারণ কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। ৩ টাকা থেকে এক লাফে ৩০০ টাকা বৃদ্ধি করার কোন সরকারী বিধান নেই। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে শহরাঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে বন্দোবস্তীর ক্ষেত্রে সালামী নেয়ার কোন বিধি বিধান নেই।

কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাভূক্ত খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানার ৫টি ও মহালছড়ি থানার ১১টি মৌজার হেডম্যানগণ সম্মিলিতভাবে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক উল্লেখিত সিদ্ধান্ত বাতিল করে পূর্ব নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করা হবে বলে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ অবধি তা কার্যকর করা হয়নি।

সরকারী নিয়মনীতিকে লঙ্ঘন করে এবং ইচ্ছামত একতরফা ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি এবং অবৈধভাবে সালামী নির্ধারণ জুম্মদেরকে নানা কৌশলে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যেই করা হচ্ছে বলে এলাকাবাসী মনে করে। তাই অচিরেই এই অবৈধ হারে রাজস্ব ও সালামী আদায় বন্ধ করার জন্য এলাকার অধিবাসীরা দাবী জানিয়েছে।

মন্তব্য প্রতিবেদন

কেমন আছে চুক্তি বিরোধীরা ?

চুক্তি বিরোধী বলতে রাজনৈতিকভাবে যা বুঝানো হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় সেভাবে বুঝানো হয় না। জুম্ম জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে যেটা চালু আছে সেটা হচ্ছে প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপ যারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবীদার তাদেরকেই বুঝানো হয়। বিগত সংসদ নির্বাচনের পর তারা কেমন আছে? তাদের রাজনৈতিক আলামত কি-তা কিন্তু জুম্ম জনগণের মধ্যে নিত্যদিনের জিজ্ঞাসা। কারণ তারা তাদের হীন কার্যকলাপের দ্বারা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় অঞ্চলে একের পর এক সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করে চলেছে।

রাজনৈতিক মারপ্যাচে এই তথাকথিত চুক্তি বিরোধীরা সংসদ নির্বাচনের পর এক পর্যালোচনা বৈঠকে বসে। ঐ বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও তাদের কট্টর সমর্থকদের কাছ থেকে যা শোনা গেছে তা হচ্ছে এই- এবারে তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৪ হাজার ভোট পেয়েছে। এটা কম নয়। আগামী পাঁচ বছর পরে তারা অবশ্যই নির্বাচনে জিতে যাবে। এই বক্তব্যটা সাধারণভাবে তাদের ইঁচড়ে পাকা সমর্থকদের মধ্যেও শোনা গেছে। কিন্তু আগামী পাঁচ বছর পর বহিরাগত বাঙালী ভোটার (বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে) কত পরিমাণে বেড়ে যাবে তা তাদের হিসেবে নেই। শুধু তাদের যে সুবিধে হবে - সেটাই তাদের হিসেব নিকেশ।

যাই হোক তাদের রাজনীতির মারপ্যাচটা আরো একটু ভিন্ন। নির্বাচনের পরে পরে কয়েকটা জায়গায় তারা মতবিনিময় সভা করেছে। ঐ সভায় তারা জনসংহতি সমিতি এর সাথে সমঝোতায় আসার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে কিছু সংখ্যক জুম্ম চাকুরীজীবিকে দায়িত্ব দিতে চেয়েছে। কিন্তু পেশাগত কারণে তারা যেহেতু অপারগ তাই অগত্যা তাদের কিছু ছদ্মবেশী কর্মীকে দায়িত্ব দিতে হয়। তাদের মধ্যে পৌর কমিশনার সরোজ কুমার চাকমা, ধীমান খীসা, বিম্বিসার চাকমা, চন্দন দেওয়ান, উদয় জীবন চাকমা প্রমুখ তথাকথিত নিরপেক্ষ লোকজনকে। উল্লেখ্য যে, তাদের এই সমঝোতা প্রস্তাব ইতিপূর্বে বেশ কিছু স্থানীয় মুরুব্বী প্রচেষ্টা চালিয়ে রাজনৈতিক খেলায় বাজিমাত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তেমনটি সুবিধে না হওয়াই এব্যাপারে তারা হতাশ। তাই তথাকথিত নিরপেক্ষ মহলটির ঐ উদ্দেশ্য সাধনে তেমন সুবিধা হয়নি। অধিকন্তু এব্যাপারে জেএসএস এর মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। কারণ জেএসএস মনে করে- ঐ প্রসিত-সঞ্চয়দের জন্মই হয়েছিল জেএসএস এর গর্ভে। ঐ জেএসএস এর নেতৃত্ব তাদের পছন্দ না হওয়ার কারণেই তারা যেহেতু স্বেচ্ছায় বিভেদপন্থা গ্রহণ করে অন্য একটি চক্র জীবন গঠন করেছে এবং নিজেরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সন্ত্রাসী দলও গঠন করেছে। এই অবস্থায় আবারো সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ ঐ বিভেদপন্থী গিরি প্রকাশ দেবেন পলাশ চক্র ১৯৮৩ সালে যে ষড়যন্ত্র করে প্রয়াত নেতাকে হত্যা করেছিল একই পলিসি নিয়ে এই নব্য চক্ররাও এগুতে চায়। কাজেই জেএসএস এর কাছে এই প্রস্তাব মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আর এই প্রস্তাবটা আনা হচ্ছে শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি সদরের মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের মাধ্যমে। সেটা বান্দরবানেও নেই, রাঙ্গামাটিতেও নেই, নেই গ্রামাঞ্চলের কোন জায়গায়। সুতরাং একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টার যেই পরিণতি সেই পরিণতিই হয়ে গেছে অর্থাৎ মরা ছেলেকেই কোলে নিয়েছে তারা।

নির্বাচনের সময়ে সৃষ্ট সুযোগটা এই চুক্তিবিরোধীরা কিন্তু ঠিক ঠিক কাজে লাগাচ্ছে। তারা নির্বাচনী অফিস খোলার পরবর্তী সেগুলো এখন দলীয় অফিস হিসেবে দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছে। ঐ চক্রদের মূল হোতা অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীটা তাদের স্থায়ী আস্থানায় পরিণত করেছে। তার বাড়ীর পাশে চালাঘরের ব্যবস্থা করে সদলবলে এমনকি নারী পুরুষে মিলে ব্যারাক জীবন শুরু করেছে। ঐ ব্যারাক জীবনেরও কিছু কিছু জটিল তথ্য বেরিয়ে আসছে জনসমক্ষে। নির্বাচনের কয়েকদিন যেতে না যেতে চুক্তি বিরোধীদের এক নায়ক শ্রীযুক্ত প্রদীপন চাকমা বালিরাজা চাকমার কন্যার সাথে এক অনাড়ম্বর বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। শোনা গেল প্রদীপনের মা বাবারা আগে ঐ বিয়েতে স্বীকৃতি দেননি তাই ঐ ব্যারাক জীবনেই তাদের বিয়ে সাদি করতে হয়। কথিত আছে ঐ আস্তানায় ঐ দুই নায়ক নায়িকা অসামাজিক ও অসদাচরণ করার সময় ঐ অনন্ত বিহারী খীসার স্ত্রী এর কাছে ধরা পড়ে। পরে শ্রীমতি অনন্ত বিহারী খীসা ঐ মেয়েটির পক্ষাবলম্বন করলে ঐ প্রদীপন নায়ককে এরকম আচমকা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নায়কের ঐ আচরণে ঐ আস্তানার শৃঙ্খলা আর টিকে থাকার কথা নয়। লোকজনের মুখেই শোনা যায় অনন্ত বিহারীর ঐ আস্তানাটা এখন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত সমাজবিরোধী সন্ত্রাসী আখড়া হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে ঐখানে বাজারটা বেশ ভালোই চলছে। তাই দেখা যায় মাঝে মাঝে ঐ আস্তানা থেকে কিছু কিছু মিছিল বের করা হচ্ছে। একসময়ের এরকম একটা মিছিল দেখা গেল কলি খীসার অপহরণের প্রতিবাদে এইচডব্লিউএফ এর বিক্ষোভ মিছিল। তারা স্মারকলিপি দিয়েছে। দায়ী করা হয়েছে জেএসএস'কে। রীতিমত টনক নড়া ব্যাপার। জেএসএস জেলা কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে- জেএসএস কাকেও অপহরণ করেনি। এটা মিজ কলি খীসার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তার ঘটনাকে আরো বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে ঢাকায় গিয়েও মিছিল করে। এটা সংবাদপত্রেও স্থান পায়। নজরুল কবির নামে জনৈক সাংবাদিক তো মন্তব্য করেই ফেলেন- কল্পনা চাকমার পরে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নারী অপহরণ। কিন্তু কিছুদিন পর (১৬/১১/০১) 'প্রতিদিন খাগড়াছড়ি' পত্রিকায় কলি খীসা নিজেই সাংবাদিকদের বললেন- 'তাকে কেউ অপহরণ করেনি। যেটুকু হয়েছে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' তাহলে মিথ্যার বেসাতি করলো কারা? মিথ্যা একটা ইস্যু সৃষ্টি করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার নুতন নুতন কৌশলে চুক্তি বিরোধীরা এতই তৎপর যে বাঙালী সাংবাদিক নজরুল কবিরকেও বেকুব বনে যেতে হলো? আসলে এই সমস্ত ধুম্রজাল সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের হীন চরিত্রকে লুকোবার এই হচ্ছে তাদের ফন্দি।

কিছুদিন আগে মহালছড়ি উপজেলায় বাপ্পী চাকমাসহ ৪ জন জেএসএস সমর্থককে চুক্তিবিরোধীরা অপহরণ করে। বাপ্পী চাকমা

থেকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা আদায় করে ছেড়ে দেয় কিন্তু আইনস্টাইন চাকমাকে ছাড়েনি। শোনা গেছে তার এক পা ভেঙে দিয়েছে; মাথা ফেটে দিয়েছে এবং চোখ একটা নষ্ট করা হয়েছে। এরপর জীবময় চাকমা যিনি জেএসএস এর মহালছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক তাকে নিজ বাড়ী থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এখন ঐ চুক্তি বিরোধীরা আর দায়িত্ব স্বীকার করে না। তার অর্থ এলাকাবাসী মনে করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর নানিয়ারচর এলাকা থেকে এমনকি খোদ বৌদ্ধ বিহার থেকে লোকজনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে তাদেরকে মোটা অংকের টাকা আদায় করে ছেড়ে দিয়েছে।

১০ নভেম্বর ২০০১ তারিখে দীঘিনালা ফেরৎ যাওয়া যাত্রীবাহী পিক আপ-এ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ছেলেদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। ঐ গুলিবর্ষণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৪ জন নেতাকর্মী আহত হয় এবং রহমত উল্লাহ নামের একজন বাঙালী ব্যবসায়ী নিহত হয়। এদিকে হেরোইনসেবীদের উচ্ছেদ করার নামে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করে এবং লোকজনকে অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয়। তাদের এক মানব বন্ধন কর্মসূচীতে স্বয়ং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক উপস্থিত থেকে তাদেরকে উৎসাহিত করে। স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে মাত্র প্রসিত চক্রের পিতা উপস্থিত থাকে। তারপরেই তারা খবংপরিয়া এলাকাতে পুলিশ দিয়ে হামলা চালায়। স্থানীয় জনগণের প্রশ্ন হচ্ছে এইসব মানব বন্ধন বা স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কি মাদক ব্যবসা বন্ধ করা যাবে? আসল বিষয়টা হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য বলতে মোটেই কিছু নেই। জনগণের কাছে যাবার সুযোগ তাদের নেই বলে তাদের এই তামাশা। অবশেষে জানা গেল স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারলে জেলা প্রশাসক চুক্তিবিরোধীদের ৪৫ হাজার টাকা প্রদান করবেন। তাই এত তোড়জোর। খাগড়াছড়ির এক গ্রামে তারা বক্তব্য দেয় যে, এইসব মাদকসেবীদের জেএসএস প্রশ্রয় দেয়। গ্রামবাসীরা বলেছিল-'আমরা যতদূর জানি জেএসএস এর নেতাকর্মীরা মদ্যপান করে না তাহলে তারা ওদের প্রশ্রয় দেবে কেন? আর মাদক ব্যবসা শুরু হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের অনেক আগে থেকে। তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা রাজনৈতিক দলের উপর অনর্থক দোষ চাপানোর অর্থ কি?' এর উত্তরে চুক্তিবিরোধীরা কিছু বলতে না পারলেও পাড়াপড়শীরা বুঝে গেছে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে কিছুই নেই। আর এই চুক্তিবিরোধীরাই যে পয়লা নম্বরের নেশাখোর ও চাঁদাবাজ তা সকলেই জানে।

এই অবস্থা দেখার পর প্রসিতের বাবা অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীতে অবস্থানরত চক্রদের থেকে একজন চলে এসে চুক্তি পক্ষে যোগ দেয় এবং আরো স্থানীয় ৩ জন সদস্যও গোপনে যোগাযোগ করে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর মধ্যে এই- তাদের কাছে ম্যাগাজিনওয়ালা পিস্তল আছে ৩টা, রিভলভার আছে ২টা আর পাইপগান থাকে ৫টা। মোট ১০টা বেআইনী অস্ত্র নিয়ে তারা কাজ কারবার চালায়। প্রসিত থাকার সময় ঐ দশটা অবৈধ অস্ত্র সবসময় সঙ্গে রাখতো আর প্রসিত চলে যাবার পর অর্ধেক গিরিফুলে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি একটু খারাপ মনে করলে আরেক বার নিয়ে আসে। ঐ ঘরে তারা ব্যারাক সিষ্টেমে থাকে। সপ্তাহে একবার মাত্র মাছ/মাংস খেতে পায় আর বাদবাকী সময়টা শুধু ঘন্ট তরকারী দিয়ে খেতে হয়। প্রসিতার মা-বাবা তাদেরকে একপ্রকার লেবারের মতো ব্যবহার করতে চায়। স্থানীয় ৩ জন বাদে অন্যরা অশিক্ষিত এবং অপরিচিত। তাদের পরিচয় জেনে নেয়া নিষেধ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, তারা অবশ্যই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায় তবে তার আগে জেএসএসকে অবশ্যই শেষ করে দিতে হবে। জেএসএস'কে শেষ করে দিতে যা যা দরকার সবই তারা করবে। এই একই উদ্দেশ্যে নাকি খাগড়াপুরের ত্রিপুরা বসতিতে হামলা করেছিল। কারণ ত্রিপুরারা নাকি চুক্তি পক্ষে কাজ করে থাকে।

খাগড়াছড়ি কলেজে চুক্তি পক্ষের ছাত্র পরিষদ একটা কমিটি গঠন করে। ঐ সদস্য তালিকা দেখে চুক্তি বিরোধীরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। তারা এখন ছেলেদের মা-বাপদের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এমনকি সাদা কাগজে ৮ জন থেকে দস্তখত নিয়ে রেখেছে যাতে নাকি তারা বিবৃতি দেবে যে, জেএসএস তাদেরকে জোর করে সংগঠনে ঢুকিয়েছে। এইভাবে জোর জবরদস্তি করে তারা সাধারণ ছাত্র ও জনগণকে রাজনৈতিক মতবাদে বাধ্য করাতে চায়। একসময় তারা আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি সদরে মিছিল করে এবং ১৫ নভেম্বরে ১১ দলের সমর্থন দিয়ে হরতাল পালন করে। কিন্তু সেদিন খাগড়াছড়িবাসী সবাই দেখেছে হরতাল এই খাগড়াছড়িতে একশত ভাগের একভাগও পালিত হয়নি। অতএব এখন আর কি করা?

তারা এখন রীতিমত ক্ষুদে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছে। খবংপড়িয়া ও নারানখাইয়াতে তাদের দৌড়াত্ম্যে জনজীবন এখন অতিষ্ঠ। তাই অনেকে বলে অনন্ত বিহারীর ঘর এখন পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দির হয়ে গেছে যেখানে প্রায় লোকজনকে নিয়ে নানাভাবে হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়।

সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সাথে চলছে ইউপিডিএফ-এর আন্তরিকতা বিনিময়

চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ চক্র 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বলে গালভরা বুলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তারা সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ মহলের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার জন্য ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তির পঞ্চম বাহিনী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনের নব্য চক্রের উত্থান ঘটিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণ, গুম, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংহতি সমিতিই তার জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন আপোষহীনভাবে চালিয়ে আসছে। চুক্তির পরও শাসকগোষ্ঠীর সাথে কোনরূপ আপোষ না করে এবং জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অটল রয়েছে। তাই শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গুলি হেলনে সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রশাসনের এক বিশেষ মহল জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করে জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করাই হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। আর শাসক-শোষক ও নির্যাতকদের সেই উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই ইউপিডিএফও চায়

জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামকে গলাটিপে হত্যা করতে। ফলে 'শত্রুর শত্রু, নিজের মিত্র' এই প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে তাদের দু'পক্ষের মধ্যে গড়ে উঠেছে অঘোষিত আতাঁত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক যাতে সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপির অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে না হয় সেজন্য তারা নানা অপকর্মের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানের ভিত্তি সৃষ্টি করে দিচ্ছে। অপরদিকে সেনাবাহিনীর উক্ত বিশেষ মহলও নানা কায়দায় ইউপিডিএফ-কে সহায়তা করে তাদেরকে সেই অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়ে চলেছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে তিন বিদেশী অপহরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী রাখার বা থাকার কৃত্রিম ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়ে এই ইউপিডিএফ চক্র সেনাবাহিনীকে বড় উপহার দিয়েছিল। তার বদৌলতে সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রশাসনও তাদের নাকের ডগায় ইউপিডিএফ এর সংঘটিত চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নাশকতামূলক কর্মকান্ড নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে নানা কায়দায় নিরাপত্তা দিয়ে এই চক্রকে সহায়তাও দিয়ে থাকে। সর্বোপরি ইউপিডিএফ চক্রকে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সেই উপহারের যথাযোগ্য পরিশোধও করেছে সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রশাসনের সেই বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল। তাই নির্বাচনের পর খাগড়াছড়িতে দেখা যায় ইউপিডিএফ চক্রের সাথে সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রশাসনের লেজে গোবরে সম্পর্ক।

সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রশাসন কর্তৃক আগেকার গুপ্তক বাহিনী ও মুখোশ বাহিনীর মতো জামাই আদর দিয়ে ইউপিডিএফ চক্রকে এখন লালন করতেও দেখা যায় প্রকাশ্যভাবে। সেনাবাহিনীর সেই মহলের কর্মকর্তারা সময়ে সময়ে আগ বাড়িয়ে ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী নেতাদের সাথে সাক্ষাৎও দিয়ে থাকে। বলতে গেলে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসন এখন ইউপিডিএফ চক্রকে বাদ দিয়ে কোন কর্মসূচীই গ্রহণ করে না। তাই গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন থেকে শুরু করে সরকারী কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর কম্যান্ডারদের মুখে গর্বের সাথে বলতে প্রায়ই শোনা যায় যে, তারা ইউপিডিএফ চক্রকে বাইরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তার অর্থ এই তারা ইউপিডিএফ চক্রের আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিল এবং এখনো আছে। আর কেবল আন্ডারগ্রাউন্ড কার্যক্রম দিয়ে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করা কঠিন, তাই ইউপিডিএফ-কে বাইরে নিয়ে এসে নিয়মতান্ত্রিক প্লাটফরমেও সমানভাবে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। সরকারী নানা প্রোগ্রামে তাদের যুক্ত করার মাধ্যমে বাইরের নিয়মতান্ত্রিক প্লাটফরমে উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যেই প্রশাসন ও সেনা কর্তৃপক্ষের এত গলদঘর্ম। তাদের মধ্যকার এই লেজে গোবরে আতাঁত সম্পর্কে খাগড়াছড়ি থেকে ইউপিডিএফ চক্রের অন্যতম হোতা 'বিধান' কর্তৃক ঢাকাস্থ ইউপিডিএফ এর 'মামু' নামে হাই কম্যান্ডকে ১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে লেখা চিঠি থেকে কিছু তথ্য মিলবে।

উক্ত চিঠিতে 'বিধান' ঢাকাস্থ হাই কম্যান্ড 'মামু'কে লিখেছে যে, **'আজ ১লা ডিসেম্বর ২০০১ জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে যুব দিবস পালিত হলো। র‍্যালী হয় খাঃ সঃ উঃ বিঃ মাঠ থেকে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে শিল্পকলা একাডেমী পর্যন্ত। র‍্যালী শেষে আলোচনা সভা হয়। এতে জেলা প্রশাসক UPDF এর মানববন্ধন কর্মসূচী, গণস্বাক্ষরের অভিযান কার্যক্রমগুলো খুবই প্রশংসা করেন। টচউথ এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখে প্রমেশ্বর চাকমা....'**। শাসকগোষ্ঠীর একজন আমলার মুখে জুম্ম জনগণের 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর জন্য আন্দোলনরত (?) কোন সংগঠনকে প্রকাশ্য সভায় প্রশংসা করা সত্যিই আশ্চর্য্য বটে! আর একটা সরকারী অনুষ্ঠানে ছাত্র পরিষদের কোন নেতাকে (প্রমেশ্বর চাকমা ইউপিডিএফ এর পিসিপির সাধারণ সম্পাদক) বক্তব্য দেয়ার সুযোগ প্রদান পরিষদের এযাৎকালের ইতিহাসে কখনোই ঘটেনি। ইউপিডিএফ সমর্থিত মুষ্ঠিমেয় বিপথগামী তথাকথিত ছাত্রদের নিয়ে গড়া ছাত্র পরিষদের সাথে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর 'শত্রুর শত্রু, নিজের বন্ধু' এ প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে গড়ে উঠা অঘোষিত আতাঁতের ফলে এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে বলা যায়। প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় মানববন্ধন কর্মসূচী, গণস্বাক্ষর অভিযান ইত্যাদি নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে খুনী ইউপিডিএফ-কে আন্ডারগ্রাউন্ডের পাশাপাশি ওভারগ্রাউন্ডেও space তৈরী করে দেয়া এবং ওভারগ্রাউন্ডেও 'শক্ত প্রতিপক্ষ' হিসেবে ইউপিডিএফকে জনসংহতি সমিতির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড় করানোই হচ্ছে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য।

চিঠিতে 'বিধান' আরো লিখেছে যে, **'খাগড়াছড়ি ব্রিগেডে এক নতুন জি-টু বদলি হয়ে এসেছে। সে UPDF এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানালে আজ দীপ্তির নেতৃত্বে যাওয়া হয়। G-2 খুব আন্তরিকতা দেখালেন। ৪/৫ দিন আগে শিবমন্দিরে এক ঘটনা - আমাদের কালেক্টরের গ্রুপ একটি ট্রাক আটকায়। কিন্তু সেটি আর্মিদের। তারা পানছড়ি-তবলছড়ি সড়কের নির্মাণ সামগ্রী সেই ট্রাকে করে নিচ্ছে। ঘটনাটা তাদের কানে গেলে ঘটনাস্থলে আর্মি পৌঁছে এবং আমাদের ছেলেদের হদিশ নেই। তারা কাউকে পায়নি। বর্তমানে অবস্থা শান্ত।'**

চিঠির উক্ত ভাষ্যই প্রমাণ করে সেনাবাহিনীর সাথে কত মধুর সম্পর্ক রয়েছে ইউপিডিএফ এর। তাই চাঁদাবাজির জন্য ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র কালেক্টররা সেনাবাহিনীর ট্রাক আটকালেও কেউ ধরা পড়ে না। সেনাবাহিনী গত বছরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে অপহৃত তিন বিদেশী উদ্ধারের মতো নাটক করে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাওয়ার নিরাপদ সুযোগ করে দেয় বলে কেউ ধরা পড়ে না তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। ধরা পড়ার তো প্রশ্নই উঠে না, যেখানে দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় দুই সেনা ক্যাম্পের মাঝে ইউপিডিএফ এর আস্তানা ও কালেকশন পোষ্ট, বরকল উপজেলার বেতছড়ি ও মাছছড়িতে সেনা পোষ্টের মাঝখানে ইউপিডিএফ পোষ্ট কিংবা নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের লাগোয়া ইউপিডিএফ এর কালেকশন পোষ্ট নিরাপদে ও প্রকাশ্যে অবস্থান করতে পারে। আর অতর্কিতে না হয় সেনাবাহিনীর একটা ট্রাক আটকা গেল, তা তো ইউপিডিএফ এর ক্ষেত্রে স্রেফ slip of accident মাত্র।

অন্যথায় কোন মামুলী ঘটনা ঘটলেই গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে তবলছড়ি হতে পানছড়ি আসার পথে ঝর্ণাটিলা সন্নিকটে একটি যাত্রীবাহী জীপে সংঘটিত ডাকাতির ফলে সেনাবাহিনী যেভাবে সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীকে ধর-পাকড়, অপারেশন ও হয়রানি করে থাকে সেভাবে অত্যাচার-নিপীড়ন করতো কিংবা ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল সংঘটিত বাঘাইহাট বাজারে জুম্মদের উপর সেনাবাহিনীর

হামলা (যেখানে ৫১ জন জুম্ম আহত) বা একই বছরের ১০ অক্টোবরে বাবুছড়া বাজারে অনুরূপ সংঘটিত ঘটনার (যেখানে ৩ জন জুম্ম নিহত, ১৪০ জন আহত এবং ৭৪টি জুম্ম বাড়ী ও দোকান ভস্মিভূত) মতো লঙ্কাকান্ড ঘটে যেতো।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ মহলের সাথে গভীর সখ্যতা আছে বলেই নুতন জি-টু বদলি হয়ে আসতে না আসতেই ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করতে আগ্রহ দেখান এবং মমতাভরা আন্তরিকতা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। আলাপ-আলোচনায় উভয় পক্ষ গুণমুগ্ধ হন। কারণ স্ব স্ব হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে গেলে তাদের একে অপরকে আন্তরিকভাবে দরকার। তাই বর্তমানে চলছে ইউপিডিএফ ও সেনাবাহিনীর সেই মহলের মধ্যে সেই আন্তরিকতা বিনিময় ও সৌজন্য (?) সাক্ষাৎ। নিম্নে ইউপিডিএফ এর অন্যতম সন্ত্রাসী হোতা 'বিধান' কর্তৃক লিখিত চিঠির অবিকল কপি পত্রস্থ করা হলো।

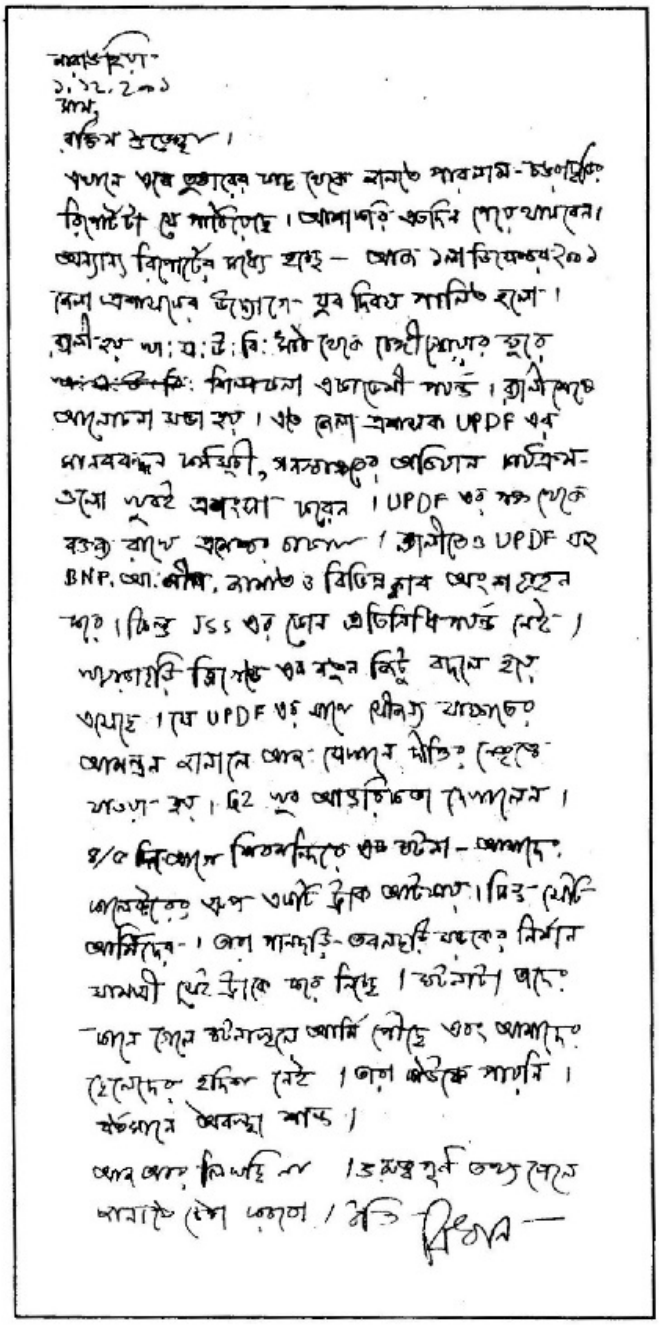

বন বিভাগ কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

জটিলতা ছাড়া বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করে আসছে এবং জুম চাষসহ এসব এলাকা থেকে পরিবারের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ আহোরণ করে আসছে। প্রথাগত ভূমি মালিকানা ভিত্তিতে ভোগ দখল করে আসার ফলে তাদের মধ্যে যেমন কোনরূপ সমস্যা বা জটিলতা দেখা দেয়নি তেমনি সরকারের নিকট বন্দোবস্ত ীরও কোন প্রয়োজন হয়ে পড়েনি। ফলে অনেকে এখনো ভোগ দখল করে আসলেও বন্দোবস্তীর জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেনি। তাদের এই প্রথাগত ভূমি মালিকানাকে লঙ্ঘন করে এসব এলাকায় সংরক্ষিত বন সৃষ্টি করা হলে তারা সকলেই এসব ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে এবং জীবন-জীবিকার চরম সংকটে পতিত হবে। তাই এসব এলাকায় সংরক্ষিত বন সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তাদেরকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদানের জন্য এলাকার জনগণের পক্ষে ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন হেডম্যান, কার্বারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি রাজস্থলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা যায়।

অপরদিকে বনায়নের নামে একই কায়দায় বান্দরবান জেলাধীন রাজভিলা মৌজায় ১,০০০ একর জমি থেকে জুম্মদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে বলেও খবর পাওয়া যায়। এসব এলাকায় স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের অনেকে বন বাগানও সৃষ্টি করেছে বলে জানা যায়। ৩১৯নং রাজভিলা রেঞ্জের বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এসব রোপিত গাছ কেটে পাচার করছে বলেও এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেছে। বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে উক্ত রেঞ্জের বন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক জুম্মদের রোপিত গাছ কেটে নেয়ার সময় স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীরা বাধা দিলে বন বিভাগের লোকজনের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে একজন জুম্ম আহত হয়। এ সময় বন বিভাগের একজন সেটেলার লেবারের গায়েও সামান্য আঁচড় লাগে। এই আহত সেটেলারকে হাসপাতালে নেয়ার ফাঁকে বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অপপ্রচার করে যে, জুম্মরা তিন জন বাঙ্গালী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ফলে স্থানীয় সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা উদল বনিয়া গ্রামে তল্লাসী করতে যায়। পরে ঘটনাটা মিথ্যা প্রমাণিত হলে সেনা সদস্যরা ফিরে আসে। কিন্তু স্থানীয় জুম্মরা এই অপপ্রচার শুনে হতবাক হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি উপজেলা এবং বান্দরবান জেলাধীন রাজভিলা এলাকায় প্রথাগত ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে জুম চাষের সময় প্রত্যেক বছর বন রক্ষীদের গুলিতে অনেক জুম্ম খুন হয়ে থাকে। বন বিভাগ মনে করে যে, জুম্ম অধিবাসীরা প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও ভোগদখল করে আসা জায়গা-জমি বন বিভাগের আওতাধীন এবং এসব এলাকায় জুম্মদের জুম চাষ অবৈধ। ফলে জুম চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা কালে বন রক্ষীদের গুলিতে প্রত্যেক বছর অনেক জুম চাষী খুন হয়ে থাকে। প্রশাসনের নিকট এসব খুনের বিচার চাইলেও জুম্মরা কোন দিন সুবিচার পায়নি। আর বছরকে বছর ধরে চলা এসব মামলার খরচ নির্বাহও গরীব ও অশিক্ষিত জুম্মদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সাংগঠনিক সংবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৪র্থ বর্ষপূতি পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন জেলা ও থানা শাখার উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৪র্থ বর্ষপূর্তি পালন করা হয়। 'অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে' পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ আয়োজন করে দিনটি উদযাপন করা হয়।

রাঙামাটিতে জনসংহতি সমিতির সদর থানার উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি গৌতম কুমার চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা নির্মলেন্দু ত্রিপুরা। লংগদুতে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা এবং বাঘাইছড়িতে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা মামুনুর রশিদ ও বিশিষ্ট লেখক সঞ্জীব দ্রং উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িতে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা সুধাসিন্ধু খীসা। জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি ধীর কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা ও সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক তাতিন্দ্র লাল চাকমা। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে শ্যামল প্রসাদ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির অন্যতম নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরা। খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানা সদরেও অনুরূপ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, আলিকদম, রোয়াংছড়ি, থানছি প্রভৃতি থানায় পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জেলা ও থানা সদরে আয়োজিত সমাবেশে শত শত নর-নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে চুক্তির নিম্নোক্ত অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়-

১. **স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং উক্ত ভোটার তালিকা দিয়ে জাতীয় সংসদসহ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।**

২. **সকল সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপির অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া।**

৩. **ভূমি কমিশন গঠন ও পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ।**

৪. **আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।**

৫. **ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা।**

৬. **ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিষয়সহ পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বভূক্ত ৩৩টি বিষয় কার্যকর করা।**

৭. **পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকরকরণ।**

৮. **ভূমিহীন পাহাড়ীদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান।**

৯. **পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন করা।**

১০. **পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা।**

১১. **সকল ক্ষেত্রে সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা।**

১২. **সহজ শর্তে ঋণ প্রদানসহ জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্যদের পুনর্বাসন করা।**

১৩. **বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি।**

জেএসএস প্রতিনিধিদলের ঢাকা সফর

সম্প্রতি জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি গৌতম কুমার চাকমার নেতৃত্বে সমিতির ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ঢাকায় দুই দফায় সফর করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা, ভূমি বিষয়ক সম্পাদক রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও কেন্দ্রীয় সদস্য কে এস মং মারমা।

প্রতিনিধিদল প্রথম দফায় ১১, ১২ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০০১ যথাক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপ-মন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচন ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভূমি কমিশন আইন সংশোধনসহ ৭ দফা সম্বলিত স্মারকলিপির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবও উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিসহ পেশকৃত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখে এফেকটিভ এ্যাকশন নেয়া হবে বলে মন্ত্রী জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে- পাহাড়ীদের জীবনধারার উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করা

হবে না। পাহাড়ীদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখবেন। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেন যে চুক্তিটা আওয়ামী লীগ সরকার করেছে। সুতরাং চুক্তিটা তাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিনিধিদল প্রধান বলেন যে, ১৯৭৯ সালের শেষান্তে সরকার পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের বক্তব্য উত্থাপন শুরু হয়। অতঃপর ১৯৮৫ হতে মোট ২৬ (ছাব্বিশ) বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি ১৯৯৭ সালে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের আওতায় সম্পাদন করা হয়েছে। এতে মন্ত্রী বলেন, চুক্তিতে পাহাড়ীদের স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষণ করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং তাদের (সরকারের) স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় তা খেয়ালে রেখেই চুক্তিটা পর্যালোচনা করা হবে।

সমিতির প্রতিনিধি দল বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ কমিশন আইন-২০০১'-এ ল্যান্ড কমিশন চেয়ারম্যানকে একক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তা যুক্তিসঙ্গত নয়। পরিবর্তে কমিশন চেয়ারম্যানকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে রায় ঘোষণার আইন প্রতিস্থাপন করা বিষয়ে প্রতিনিধিদল প্রধান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রী এ আইন সংশোধনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা করার বিধান প্রণয়ন highly political matter। তা প্রধানমন্ত্রীর নিকট উত্থাপন করতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রয়াত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মরণে মহান জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব গ্রহণ ও শোক পালন বিষয়টি উত্থাপন করা হলে মন্ত্রী মহোদয় সংসদে তা করা হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। আলোচনা কালে মন্ত্রী ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা জজ আদালত ও জেলা দায়রা আদালত স্থানীয় আইন ও বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেন। সুধাসিন্ধু খীসাসহ প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ অনুকূল মত প্রকাশ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপ-মন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ানের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলী, পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশবাহিনী, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচন ও ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও ভূমি বেদখল, চাকুরীতে পুনর্বহালকৃত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সুযোগ-সুবিধাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ৩৩ দফা সম্বলিত স্মারকলিপি উপ-মন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করা হয়। তাঁর (উপ-মন্ত্রী) আওতাধীন বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে উপ-মন্ত্রী জানান। প্রতিনিধিদলের অনুরোধের প্রেক্ষিতে উপ-মন্ত্রী বলেন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে উল্লেখিত ৩৩টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার সংক্রান্ত ধারায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত ধারা সংযোজন এবং উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা ১৯৯৯ এর ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার সংক্রান্ত ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য ভোটার তালিকা বিষয়ক বিধান বা শর্তাংশ সংযোজন করার বিষয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়। পরে ৩০ ডিসেম্বর ২০০১ লিখিতভাবে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়।

দ্বিতীয় দফায় ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ ও ৩ জানুয়ারী ২০০২ যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকী ও ভূমি বিষয়ক মন্ত্রী এম শামসুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সাথে সাক্ষাৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশবাহিনী, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচন ও ভোটার তালিকা সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য ৩৩টি বিষয় সম্বলিত চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়াবলীও উত্থাপন করা হয়। তিনি বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর গোচরে নেবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান।

সমিতির প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সম্পর্কে, ভূমি কমিশন সম্পর্কে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত আইনী জটিলতা নিরসন সম্পর্কীত বিষয়াবলী ভূমি বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন। উক্ত ৩৩টি বিষয়ও তাঁর নিকট উত্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিনিধিদল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলের শেষান্তে হতে সম্প্রসারিত সেটেলার গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেওয়া এবং পাহাড়ীদের ভূমি বেদখল ও গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ সম্পর্কীত বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরে। এতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়।

এছাড়া জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল-নোমান এবং মৎস্য সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকার সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়।

পিসিপির ১০ম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিগত ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০০১ তিনদিনব্যাপী রাঙামাটিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ১০ম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। রাঙামাটি পৌরসভা চত্বরে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রায় এক হাজারেরও বেশী নেতা-কর্মী যোগদান করে। সংগঠনের সভাপতি ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে সাবেক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রবীণ ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত থাকেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সহ সভাপতি ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক কমরেড রহিন হোসেন প্রিন্স এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের চট্টগ্রাম জেলা পাঠচক্রের সমন্বয়ক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। উদ্বোধক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কর্তৃক জাতীয় পতাকা এবং পিসিপির সভাপতি ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা কর্তৃক পিসিপির দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

উদ্বোধনী সমাবেশে উদ্বোধক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করলেও চুক্তি বাস্তবায়ন না করার ফলে সরকার জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে। অপরদিকে ইউপিডিএফ নামে একটি জঙ্গীগ্রুপকে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এহেন কর্মকান্ডের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এখন সুখে ঘুমাতে পারে না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম দিন দিন অশান্ত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। তিনি আরো বলেন, 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক স্পিরিটকে পদদলিত করে চলেছে। তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিগত সরকার ইউপিডিএফ নামে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপকে মদত দিয়েছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে এই সন্ত্রাসী গ্রুপকে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইভাবে বর্তমান জোট সরকারের আমলে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ইউপিডিএফ-কে মদত দিয়ে চলেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, জনসংহতি সমিতি কোন দলের সাথে চুক্তি করেনি, করেছে সরকারের সাথে। তাই তিনি চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্র না করে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে আগামীতে দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

'জুম্ম জাতিসত্ত্বাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কর' - প্রতিনিধি সম্মেলনের এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তিতে সংগঠনের দুই দিন ব্যাপী প্রতিনিধিদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংগঠনের সাংগঠনিক অবস্থা ও করণীয়, বিভেদপন্থীদের অপকর্ম ও চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে ব্যাপক ও চুলছেড়া আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। এতে অভিমত রাখা হয় যে, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার বিভেদমুলক ও বিভ্রান্তিমুলক তৎপরতাসহ চুক্তিবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছাত্র গণ প্রতিরোধ জোরদার করা প্রয়োজন। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জুম্ম জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে ২৪ জানুয়ারী ২০০২ তারিখে তিন পার্বত্য জেলাসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হবে। এছাড়া আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম জোরদার করার লক্ষ্যে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম সুদৃঢ় ও জোরদার করা হবে। এলক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলাসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে সাংগঠনিক সফরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে সংগঠনের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর থানা কাউন্সিল সম্পন্ন

১৮ জানুয়ারী ২০০২ইং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বন্দর থানা কাউন্সিল ও সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ১৮ জানুয়ারী সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় চট্টগ্রামস্থ ব্যারিষ্টার সুলতান আহমেদ কলেজ হল রুমে বন্দর থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সহ সভাপতি সমর বিজয় চাকমার সভাপতিত্বে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বোধিসত্ব চাকমা, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুদীর্ঘ চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদিকা অরুমিতা চাকমা। কাউন্সিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি শুভ্রময় চাকমা, সহ সভাপতি শান্তি চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আনন্দ চাকমা প্রমুখ ছাত্রনেতৃবৃন্দ। পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সমর বিজয় চাকমা ও কালিঞ্জয় চাকমাকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত হয়।

পিসিপির এ কাউন্সিলকে ভন্ডুল করার জন্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে থাকে। ব্যারিষ্টার সুলতান আহমেদ কলেজ কর্তৃপক্ষ যাতে হল রুম বরাদ্দ না করে সেজন্যে তারা হীন চেষ্টা করে। পরিশেষে তা ব্যর্থ হয়ে পাহাড়ী ছাত্রছাত্রী ও শুভাকাঙ্খীদের হুমকি দেয় যে, যারা এ কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করতে যাবে তাদের চরম পরিণতির মুখোমুখী হতে হবে। এমনকি কাউন্সিল চলাকালীন সময়েও তারা আক্রমণের অপচেষ্টা করে থাকে। চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এর সকল ষড়যন্ত্র ও হুমকি উপেক্ষা করে ব্যাপক ছাত্রছাত্রী ও শুভাঙ্খীদের স্বর্তঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৫ম বন্দর শাখা সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত সভায় যোগদান

১৮ জানুয়ারী ২০০২ রাঙ্গামাটি জেলা কাপ্তাই উপজেলায় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহবুব কর্তৃক আহুত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্ত সভায় জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা নেতৃত্বাধীন এক প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য দু'জন সদস্য ছিলেন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য নুরুল আলম ও ডাঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। এ সভায় চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক ও রাঙ্গামাটির বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। এ প্রতিনিধিদল কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পল্লী বিদ্যুতায়ন বিষয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর নিকট ৭ দফা সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। এতে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে কর্ণফুলী হ্রদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত করা ও অপরাপর সদস্য পদে পরিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা, জলেভাসা জমির চাষাবাদের সাথে সঙ্গতি

রেখে হ্রদের পানি হ্রাস-বৃদ্ধির বাৎসরিক রুল কার্ভ পুনঃনির্ধারণ করা এবং বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি ও কাপ্তাই হ্রদের জলের পরিমাণ বিবেচনায় রেখে বিশেষতঃ জুন-জুলাই ও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ চাষাবাদের ধান বা অন্যান্য ফসলাদি রোপন ও সংগ্রহকালে জল নিষ্কাশন ও জল ধারণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দাবী জানানো হয়। এছাড়া পরিচালনার সুবিধার্থে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুতায়ন প্রকল্প' এর সার্কেল অফিসের দায়িত্ব চট্টগ্রাম হতে রাঙ্গামাটিস্থ পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেলের উপর ন্যস্ত করা, পার্বত্যবাসীদের সুবিধার্থে 'ষোল শহর বিদ্যুতায়ন প্রকল্প - ২য় পর্যায়' এর দপ্তর চট্টগ্রাম হতে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করা এবং বিদ্যুতায়নের সুবিধার্থে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার সদরে বিদ্যুতের গ্রীড সাব-ষ্টেশন স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিমন্ত্রী প্রস্তাব করেন। এ সময় প্রতিনিধিদল বলেন, সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং ইহা ব্যাপক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া দুরূহ। তাই গ্রীড লাইন থেকে সরাসরি বিদ্যুতায়ন করা দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ২টি ইউনিট স্থাপন প্রসঙ্গে এক আলোচনায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে সমীক্ষা চালানো হবে। সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান। এক্ষেত্রে এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের মতামতের উপর প্রাধান্য দেয়া উচিৎ বলে প্রতিনিধিদল অভিমত ব্যক্ত করেন।

সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা

জেএসএস নেতার যোগদান

১১ ডিসেম্বর ২০০১ ঢাকায় ১১ দলের আহুত 'সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা রুখে দাঁড়াও' শীর্ষক আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে সমিতি ও পিসিপির এক প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। ঢাকার শহীদ তাজুল ইসলাম মিলনায়নে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন গণ আজাদী লীগের সভাপতি আলহাজ আবদুস সামাদ আজাদ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ আনিসুজ্জামান, জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এ বি এম মুসা, আলী আকসাদ, নাট্যশিল্পী আতাউর রহমান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের রবীন্দ্রনাথ সরেন, নারী সমাজের শামসুন্নাহার জোৎস্না, শ্রমিক নেতা আবদুল কাদের হাওলাদার, নির্মল রোজারিও ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতা হাসান তারিক সোহেল। ১১ দলের পক্ষে সূচনা বক্তব্য রাখেন ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং ঘোষণাপত্র পাঠ করেন বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোজাহেদুল ইসলাম সেলিম। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন গণ ফোরামের সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, বাসদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, সাম্যবাদী দলের দীলিপ বড়ুয়া, বাসদের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের অজয় রায় ও পংকজ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

[illegible]
........। সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, বিএনপি ও জামাত সরকার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মারাত্মক ঘটনাবলীকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' আখ্যায়িত করে অন্যের উপর দোষ চাপানোর মাধ্যমে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে উৎসাহিত করেছে। তারা সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য ও প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান জানান। ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় দোষীদের বিচার, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ, দেশান্তরীদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন, সংবিধানের প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনী বাতিল এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানানো হয়। সভায় ১১ দল সংখ্যালঘুদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে 'সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের দাবী জানিয়েছে।

সিটিজেন ভয়েস এর সেমিনারে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী

১১ ডিসেম্বর ২০০১ সিটিজেনস ভয়েস এর উদ্যোগে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অত্র সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী আবুল মোমেনের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশ মানবাধিকার পরিস্থিতি ঃ সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা ও পলাশ খীসা।

সেমিনারের শুরুতে সিটিজেনস ভয়েস এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিভূ রঞ্জন সরকার। সেমিনারে মানবাধিকারের পরিস্থিতির উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংবাদিক হাসান মামুন। এতে বক্তব্য রাখেন সামাজিক আন্দোলনের নেতা অজয় রায়, অধ্যাপক মোঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক হামিদা বানু, বিশিষ্ট সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, জাতীয় দৈনিক অবজারভার এর সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, গণতান্ত্রিক আইনজীবি সমিতির এডভোকেট জেয়াদ আল মালুম, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সুলতানা কামাল, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ডঃ আবুল বারকাত, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও জনসংহতি সমিতির পলাশ খীসা প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, গণ ফোরামের পংকজ ভট্টাচার্য, এডভোকেট জে কে পাল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি তুলে ধরে পলাশ খীসা বলেন যে, 'নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু জনগণের উপর যে জঘন্য নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে অন্যান্য অঞ্চলে নতুন ঘটনা; কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জাতিগুলো দীর্ঘদিন ধরে এর চাইতেও বেশী নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। ১৯৯৭ সালে চুক্তি সম্পাদিত হলেও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বিস্ফোরণমুখ।'

সেমিনারে সরকারের প্রতি তিনটি দাবী জানানো হয়। দাবীগুলো হলো - (১) সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের উপর নির্যাতন বন্ধ করা; (২) রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় আটক লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এর নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করা এবং (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

সংবাদ প্রবাহ

বহিরাগত সেটেলার দুর্বৃত্ত কর্তৃক শিশু কল্পনা চাকমা আক্রান্ত

গত ১৬ নভেম্বর ২০০১ রোজ মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় বহিরাগত সেটেলার আবু মোতালেব ও তার ছেলে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন পাকুখালী গ্রামের অমর জীবন চাকমার বাড়ী লুটপাট করে। এসময় অমর জীবন চাকমা ও তার স্ত্রী কাজের জন্য বাড়ীর বাইরে ছিল। দুর্বৃত্তরা তাদের শিশু কন্যা কল্পনা চাকমাকে (১০) বাড়ীতে একা পেয়ে বাড়ীর সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। লুটপাটের এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তরা কল্পনা চাকমার কানের সোনাও ছিনিয়ে নেয়। এসময় কল্পনা চাকমা বাঁধা দিতে চাইলে তার কাঁধে ধারালো দা দিয়ে কোপ মেরে দুর্বৃত্তরা তাকে জখম করে। এদিকে অমর জীবন চাকমা বাড়ীতে ফিরে তার শিশু কন্যাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তাকে লংগদু রাবেতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের দু'দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোন মতে কল্পনা চাকমাকে সুস্থ করে তোলেন। এব্যাপারে প্রশাসনকে অবহিত করা হলেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পানছড়ির এক ডাকাতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুম্মদের উপর সেনাবাহিনীর হয়রানি

গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ সকাল ১১ ঘটিকার দিকে তবলছড়ি হতে পানছড়ি আসার পথে ঝর্ণাটিলা সন্নিকটে একটি যাত্রীবাহী জীপ ডাকাতির শিকার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র সেখানকার সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিরীহ জুম্মদের ধর-পাকড় ও নানা ধরনের হয়রানি করে যাচ্ছে। ডাকাতির পর পরই স্থানীয় ঝর্ণাটিলা আর্মী ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ঐ জীপের যাত্রী নিরীহ ও নির্দোষ ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, পিতা শশীরাম ত্রিপুরা, গ্রাম গৌরাঙ্গ পাড়া, থানা মাটিরাঙ্গাকে আটক করে। পরবর্তীতে পানছড়ি বাজার হতে বাড়ী ফেরার পথে পানছড়ির মরাটিলা গ্রামের অধিবাসী প্রার্থণা কুমার ত্রিপুরা, পিতা জোয়ানমণি ত্রিপুরাকেও আটক করে। ধৃত দুই ব্যক্তিকে সেনা সদস্যরা অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে পানছড়ি থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। থানায়ও তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হয়। উল্লেখ্য যে, প্রার্থণা কুমার ত্রিপুরা জীপ ডাকাতির সময় তার দশ বছরের মেয়েসহ পানছড়ি বাজারে উপস্থিত ছিল।

৩ ডিসেম্বর ২০০১ মরাটিলা লতিবান ইউপির তিনজন কার্বারী গ্রেপ্তারকৃত নির্দোষ দুই ব্যক্তির খবর নেয়ার জন্য থানায় আসলে তাদেরকেও একদিন আটক রেখে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় এবং একই দিনে ঝর্ণাটিলার আর্মী ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা দুপুরে মরাটিলা গ্রামে গিয়ে অংগজ মারমা, পিতা কালাউ মারমা ও দেব রঞ্জন ত্রিপুরা, পিতা সদায় রঞ্জন ত্রিপুরাকে বেদম মারধর করে এবং গ্রামবাসীকে নির্দেশ দিয়ে আসে যে, যাত্রীবাহী গাড়ীর উপর ডাকাতি করা ডাকাতদের ধরিয়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক হাটবাজার দিনে (রবিবার) মরাটিলা গ্রামবাসীকে রাস্তা পাহাড়া দিতে হবে। অন্যথায় যে কোন ঘটনার জন্য তারা (গ্রামবাসীরা) দায়ী থাকবে বলে সেনা সদস্যরা হুমকি দিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবের গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দাবী ও এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবী জানানো হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বর্তমানে ঐ এলাকার নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। অনেকেই ঘরবাড়ী ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বন্দুকভাঙ্গায় চুক্তিবিরোধীদের হানা

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে বেলা ১ ঘটিকার সময়ে রাঙামাটি সদর থানাধীন বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নস্থ ভারবোয়াচাপ নামক গ্রামে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ চক্রের অন্যতম চিহ্নিত সন্ত্রাসী তপন জ্যোতি চাকমা (কল্যাণ) এর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের একটি সশস্ত্র দল অতর্কিতে হামলা চালিয়ে একটি বাড়ী লুটপাট করার পর অগ্নিসংযোগ করে এবং চারজন ব্যক্তিকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে আহত করে।

সেদিন বেলা ১টায় ভারবোয়াচাপ নামক গ্রামটিকে সন্ত্রাসীরা ঘিরে ফেলে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের খোঁজ করতে থাকে। এতে এলাকার নিরীহ লোকজন কোনকিছু জানে না বললে তারা সেনাবাহিনীর কায়দায় ঐ গ্রামে উজ্জ্বল চাকমা (থেল) (৩০) পীং দীনমোহন চাকমা, সুমেধু বিকাশ চাকমা (৪৫) পীং দীন মোহন চাকমা ও অক্ষয় চাকমা (১৮) পীং দয়াল চাকমা প্রমুখ ব্যক্তিদের মারধর করে থাকে। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে মারধর করেও ক্ষান্ত না হয়ে উজ্জ্বল চাকমার বাড়ীতে লুটপাট করার পর অগ্নি সংযোগ করে। তখন উজ্জ্বল চাকমার সন্তান একটি গরম কাপড় উদ্ধার করতে চাইলে তাকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা যাবার সময়ে ঐ গ্রামের মধুময় চাকমা (২০), পীং বিরাজ মোহন চাকমা'কে বন্দুকভাঙ্গা মৎস্য সমিতির দেশীয় বোটসহ অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে তাকে শারীরিকভাবে অকথ্য নির্যাতনের পর মারাত্মক আহত অবস্থায় ছেড়ে দিলেও এখনো বোটটির কোন হদিস মিলেনি। এছাড়া সন্ত্রাসীরা নির্মাণাধীন বন্দুকভাঙ্গা স্বাস্থ্য ক্লিনিক এর জনৈক বাঙালী রাজমিস্ত্রীকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে ডাঃ তপন চক্রবর্তী কর্তৃক মুক্তিপণ প্রদানের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসীরা রাজমিস্ত্রীকে ছেড়ে দেয়।

কাউলীতে বাড়ীঘরে আগুন ও অপহরণসহ ইউপিডিএফের লঙ্কাকান্ড

বিগত সময়ে সেনাবাহিনী যেভাবে নৃশংসতা প্রদর্শন করে আন্দোলনকে দমন করার জন্য জুম্মদের বাড়ীঘরে লুটপাট করে

অগ্নিসংযোগ করতো ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়েছে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী চক্র। তারা গত ২৬ নভেম্বর ২০০১ তারিখে সকাল সাড়ে ৬ ঘটিকার সময়ে তপন জ্যোতি চাকমা (কল্যাণ) এর নেতৃত্বে রাঙামাটি জেলার লংগদু থানার বড়াদম গ্রামে সাধারণ লোকজনের উপর হামলা চালায়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করতে করতে গ্রামে প্রবেশ করে। এই হামলায় চুক্তিবিরোধীরা লোকজনদের মারধর এবং ১২টি বাড়ীঘর ও দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে ইউনিসেফ এর সাহায্যপুষ্ট একটি স্কুলঘরও ভস্মীভূত হয়।

এ ঘটনায় লক্ষীরাম চাকমা, পত্যারাম চাকমা, প্রভাত কুসুম চাকমা, পূর্ণ কুসুম চাকমা, সৌভাগ্য কুসুম চাকমা, অমর কুসুম চাকমা, কালিদাস চাকমা, হরিপদ চাকমা, রণবিজয় চাকমা, মঙ্গল চন্দ্রচাকমা, কালিচরণ চাকমা ও ইত্তুকবি চাকমার বাড়ী সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয় এবং বিজয় মোহন চাকমা, যশোব্রত চাকমা, রঞ্জন চাকমা ও কিরণ বিকাশ চাকমার বাড়ী প্রথমে লুটপাট ও পরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া রঞ্জন চাকমা (২৮) পীং অনিরুদ্ধ চাকমা, মঙ্গল বিহারী চাকমা (৩২), মঙ্গল চন্দ্র চাকমা (৫৫) পীং বৃষমণি চাকমা ও রস্যা (একজন বাঙালী মৎস্য ব্যবসায়ী)-কে অমানুষিকভাবে মারধর করে জখম করে।

কলি খীসাকে নিয়ে ইউপিডিএফের গোয়েবলসীয় নাটক

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি থানার কলি খীসাকে নিয়ে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ চক্র গোয়েবলীয় নাটক মঞ্চস্থ করলো। গত ৩ নভেম্বর ২০০১ স্বর্ণা চাকমা ও কবিতা চাকমার নেতৃত্বে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নামে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ চক্র অপপ্রচার করে যে, ৩০ অক্টোবর তারিখে কলি খীসা নামে তাদের একজন নেত্রী জনসংহতি সমিতি কর্তৃক অপহরণ করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নামে ইউপিডিএফ চক্র খাগড়াছড়িতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলা হয় যে, জনসংহতি সমিতি কলি খীসাকে অপহরণ করেনি। চুক্তিবিরোধীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। পরে কলি খীসা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, অপহরণ হয়েছে মর্মে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিভ্রান্তিমূলক ও সর্বৈ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃপক্ষে তাকে কেউ অপহরণ করেনি কিংবা তিনি অপহৃত হননি। থানায় কোন জিডিও করা হয়নি। অথচ ইউপিডিএফ ও জেএসএস এক পক্ষ অপর পক্ষকে দায়ী করে সংবাদপত্রে বিবৃতি ও কর্মসূচী দিয়েছে। এতে সামাজিকভাবে তাকে হয়রানি, হেয় প্রতিপন্ন ও ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। (সূত্র ঃ দৈনিক অরণ্যবার্তা, ১৬ নভেম্বর ২০০১)।

চুক্তিবিরোধী চক্র এভাবে একের পর এক মিথ্যার বেসাতি করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথে সাথে নারী পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আন্দোলন চলাকালীন সময়ে জুম্ম নারীদের উপর যেসকল নির্যাতন, ধর্ষণ ও নিপীড়ন করা হয়েছে তার বিচার দাবী করে আসছে। শুধু তাই নয় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃত্বে নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

বাপ্পী খীসাকে অপহরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে কতিপয় অঞ্চলে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ চক্র কর্তৃক অপহরণ ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তারা সাধারণ মানুষের ঘুম হারাম করে একের পর এক অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজি করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে গত ১৮ নভেম্বর ২০০১ সকাল ১০ ঘটিকায় ইউপিডিএফ এর একটি সশস্ত্র দল জনসংহতি সমিতির সমর্থিত এলাকা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানার খুলারাম পাড়ায় হামলা চালায়। হামলায় একজন জেএসএস সমর্থক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং বাপ্পী খীসা (২৬), পীং- বিনোদ বিহারী খীসা, সুজ্জিত তালুকদার(২৭), পীং- প্রভাত কুমার তালুকদার, উদয়ন চাকমা (২০) পীং- দয়ালকৃষ্ণ চাকমা এবং আইনস্টাইন চাকমা (২৮) প্রমুখ ব্যক্তিদের অপহরণ করে। অপহরণের পর ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসীরা বাপ্পী খীসার মুক্তিপণ বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা দাবী করে। বাপ্পী খীসার অভিভাবকরা গত ২৯ নভেম্বর ২০০১ তারিখে উপেন্দ্র লাল চাকমার বাড়ীতে ইউপিডিএফ এর সদস্যদের কাছে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা মুক্তিপণ দেয়। এই টাকা পাওয়ার পর চুক্তিবিরোধীরা বাপ্পী খীসা ও উদয়ন চাকমাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু আইনস্টাইন চাকমার অভিভাবকরা ইউপিডিএফ সদস্যদের ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিলেও তারা তাকে হত্যা করে।

উল্লেখ্য যে, বাপ্পী খীসা জনসংহতি সমিতির কোন নেতা বা কর্মী ছিলেন না। পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে প্রসিতের সশস্ত্র কর্মীরা এই অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় করে বলে জানা যায়। জানা যায় যে, প্রসিতের দাদী খুলারাম পাড়ায় মৃত্যুবরণ করেন কয়েক বছর আগে প্রসিতের এক চাচার বাসায়। সেই সময়ে প্রসিতের সেই চাচা ছিলেন সমাজচ্যুত। সামাজিক অপরাধ করার কারণে গ্রামের কেউ তার বাসায় যেতো না। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে প্রসিতের বাবা গ্রামের বাড়ী গিয়ে দেখতে পান তার মায়ের মৃতদেহ ছোট ভাইয়ের বাসায় গ্রামের লোকজন ছাড়া পড়ে রয়েছে। গ্রামের কেউ সেখানে নেই। দাহ করারও কোন আয়োজন নেই। প্রসিতের বাবা অনন্ত বিহারী গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বীকে ডেকে পাঠালেন তার কাছে যাওয়ার জন্য। তারপরও কেউ গেলো না। পরে তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে সবার কাছ থেকে ক্ষমা চাইলেন এবং অনুরোধ করলেন অন্ততঃ মায়ের মৃতদেহটা যেন সৎকার করা হয়। তখন গ্রামবাসী সবাই মিলে মৃতদেহকে সৎকার করলো। অনন্ত বিহারী খীসা নিজেকে অনেক পন্ডিত এবং সম্মানী মানুষ হিসেবে ভাবতেন। গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাওয়াটা অপমান হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি কোন মতেই তা মেনে নিতে পারেননি। সেই ঘটনার জন্য তার আরেক ভাইয়ের ছেলে প্রজ্ঞান খীসা ও বাপ্পী খীসাকে দায়ী করতেন। তাদের কারণে গ্রামবাসীদের কাছে মাথানত করতে হয়েছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। অনুরূপভাবে প্রসিতও তার বাবার সেই অপমানিত হওয়ার ঘটনা সহজেই মানতে পারেনি। তাই

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়। উল্লেখ্য যে, বাপ্পীকে অপহরণ করার পর তার মা অনন্ত বিহারী খীসা'র বাসায় যান ছেলের মুক্তির ব্যাপারে। তখন অনন্ত বিহারী খীসা তাকে বলেন - 'এটা ছেলেদের ব্যাপার, আমি কিছুই জানি না এবং কিছুই করতে পারবো না'। অথচ খাগড়াছড়ির সবাই জানে অনন্ত বিহারী খীসা প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতা এবং অন্যতম উপদেষ্টা। সেই সময় প্রসিত চক্র অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীতে ইউপিডিএফের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে সন্ত্রাসীদের আস্তানা গড়েছিল।

অব্যাহতভাবে চলছে ইউপিডিএফ এর খুনের জিঘাংসা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ চক্র নানা ধরনের নাটক প্রদর্শনের পর জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ও নিরীহ গ্রামবাসীর উপর একের পর এক হত্যাযজ্ঞ ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সেই খুনের জিঘাংসায় নৃসংশভাবে প্রাণ দিচ্ছে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকরা।

চন্দ্র কুমার চাকমাকে অপহরণের পর হত্যা ঃ গত ৬ অক্টোবর ২০০১ তারিখে জনসংহতি সমতির সদস্য চন্দ্র কুমার চাকমা ওরফে অমরজিৎ, পীং এরেংকজী চাকমা, গ্রাম দোজরী পাড়া, থানা মহালছড়ি জেলা খাগড়াছড়িকে চুক্তিবিরোধীরা লক্ষীছড়ি-মানিকছড়ি সড়কের রাঙাপানি ছড়া নামক স্থানের একটি দোকান হতে অপহরণ করে। তিনি নির্বাচনের সময় নির্বাচন বর্জনের জন্য জনসংহতি সমিতির কর্মকান্ডের পক্ষে প্রচারণা করছিলেন বলে তাকে অপহরণ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে অমানুষিক নির্যাতনের পর নির্মমভাবে খুন করা হয়।

আইনষ্টাইন চাকমার হদিশ মিলেনি এখনো ঃ গত ১৮ অক্টোবর ২০০১ বাপ্পী খীসা, সুজ্জিত তালুকদার ও উদয়ন চাকমাদের সাথে ইউপিডিএফ কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন আইনষ্টাইন চাকমাও (২৮)। টাকার বিনিময়ে অপর তিনজন ফিরে আসেন। আইনষ্টাইন চাকমার মুক্তিপণ বাবদ তার অভিভাবকরা ২০ হাজার দিলেও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ফেরৎ দেয়নি তাকে। তাকে একটি পা ভেঙ্গে দিয়ে, এক চোখ নষ্ট করে ও মাথা ফেটে দিয়েছে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে গ্রামের অদূরে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জীবময় চাকমাকে অপহরণের পর হত্যা ঃ গত ২০ অক্টোবর ২০০১ সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় মহালছড়ি থানাধীন করল্যাছড়ি গ্রামের বাড়ী থেকে চুক্তিবিরোধী চক্র দ্বারা মহালছড়ি থানা শাখার জনসংহতি সমতির সাংগঠনিক সম্পাদক জীবময় চাকমা পীং সুসেনমণি চাকমা অপহৃত হন এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়।

মংথাচি মারমাকে গুলি করে হত্যা ঃ গত ২৬ নভেম্বর ২০০১ পিসিপি সদস্য মংথাচি চাকমা (২২) পীং পাইছা মারমা, গ্রাম রাঙ্গাপাটি, মানিকছড়ি উপজেলাকে প্রথমে অপহরণ ও পরে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী চক্র। গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ তার ক্ষতবিক্ষত লাশ রাঙ্গাপানি গ্রামের পাশের জঙ্গলে পাওয়া যায়। মুক্তিপণের টাকা দিতে না পারায় সন্ত্রাসীরা এভাবে তাকে হত্যা করে।

অংথোয়াইচি মারমা জঙ্গল থেকে লাশ হয়ে ফিরলেন ঃ ২৬ নভেম্বর ২০০১ খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার অংথোয়াইচি মারমা (৩০) পীং অজ্যাচিং মারমা এবং মংহ্লা প্রু মারমা (২৮) একসাথে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গেলে ইউপিডিএফ চক্রের গুলিতে লাশ হয়ে ঘরে ফিরলেন অংথোয়াইচি মারমা। সেদিন তারা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহকালে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা কোন অজুহাত ছাড়াই তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। ফলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় অংথোয়াইচি মারমা এবং মংহ্লা প্রু মারমা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়।

মায়াবরণ চাকমা সামিল হলেন লাশের মিছিলে ঃ গত ৫ ডিসেম্বর ২০০১ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির সদস্য মায়াবরণ চাকমা (২৭) পীং তংগলা চাকমা, গ্রাম রাঙ্গাপানিছড়া, উপজেলা লংগদু ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের খুনের জিঘাংসায় বলি হলেন। সেদিন গ্রামের বাড়ী থেকে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে হত্যা করে তাকে।

দেববিকাশ চাকমা (সুবীর ওস্তাদ) আর নেই ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে প্রসিত-সঞ্চয় নেতৃত্বাধীন চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা শাখার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক দেব বিকাশ চাকমা ওরফে সুবীর ওস্তাদ নির্মমভাবে নিহত হন। ইউপিডিএফ চক্ররা কেবল সুবীর ওস্তাদকে হত্যা করে তা নয়, ঘটনার পর নবম শ্রেণীর একজন বালকসহ তিনজনকে অপহরণ করে থাকে।

রাত ৯টার দিকে প্রসিত-সঞ্চয়ের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী চক্রের অন্যতম হোতা বিমল চাকমা (২৭), পীং কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, সাং মধ্য হাড়িকাটা, লংগদু, আনন্দ প্রকাশ চাকমা ও তপন জ্যোতি চাকমার নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল লংগদু থানা সদরের বড়াদম গ্রামে হামলা চালায়। হামলাকারীরা প্রথমত জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নীরোদ রঞ্জন চাকমার বাড়ীতে চড়াও হয়। সেখানে তারা তাকে না পেয়ে তার বাড়ীতে আগত অতিথিদের হাত-চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। তারপর তারা লংগদু থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক দেব বিকাশ চাকমা ওরফে সুবীর ওস্তাদ (৪৫), পীং নীলচন্দ্র চাকমা এর বাড়ী ঘেরাও করে। সেখানে তারা দরজা ভেঙে দেব বিকাশ চাকমাকে জাপটে ধরে। দেববিকাশ চাকমা আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে তারা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি প্রথমে বাম হাতে গুলিবদ্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বাম হাত ভেঙে যায়। তখন তিনি দিকবিদিক জ্ঞান হারা হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা তাকে ধাওয়া করে এবং বাড়ীর বাইরে লেকের ধারে আবারও কাছ থেকে মাথা বরাবর গুলি করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই ঢলে পড়েন। তার ঢলে পড়া নিথর দেহে সন্ত্রাসীরা ছুরিকাঘাত করে এবং এলোপাথারি কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। তখন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের চিৎকারে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য

হয়। পালিয়ে যাবার সময়ে তারা চারজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতদের মধ্যে তিনজন হলেন ভূবন চাকমা (৩৫), পীং বুজ্যা চাকমা, সাং বড়াদম, জ্ঞান জ্যোতি চাকমা এবং জনসংহতি সমিতির লংগদু উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নীরোদ রঞ্জন চাকমার পুত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র দিব্যেন্দু চাকমা। প্রথমোক্ত অপহৃত দু'জন অস্ত্র জমাদানকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য। বর্তমানে তারা বরিশালে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে চাকুরীরত।

ঘটনার পর মুমূর্ষু অবস্থায় দেব বিকাশ চাকমাকে লংগদুস্থ মাইনী রাবেতা হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপরদিন তার মরদেহ রাঙামাটিতে ময়না তদন্তের জন্যে আনা হলে সমিতির শত শত নেতা ও কর্মী তাকে একবার দেখার জন্যে ভীড় জমায়। বিকালে বনরূপাস্থ পেট্রোল পাম্প চত্বরে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশ থেকে চুক্তি মোতাবেক জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অবিলম্বে ইউপিডিএফ এর সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

খাগড়াছড়িতে পিক-আপের উপর ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র আক্রমণ

গত ১০ নভেম্বর ২০০১ ইং মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে খাগড়াছড়িতে আয়োজিত স্মরণ সভায় যোগদান শেষে পিক-আপ যোগে খাগড়াছড়ি থেকে দীঘিনালায় বাড়ী ফেরার পথে পিসিপি কর্মীদের উপর অনিমেষ চাকমা (ছোট) এর নেতৃত্বে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায়। হামলায় জনসংহতি সমর্থক একজন পুরানবস্তী বাঙালী রহমত উল্লাহ (২৪), পীং আমিন শরীফ, সাং দীঘিনালা সদর ঘটনাস্থলে নিহত হন। এছাড়া বিদর্শন চাকমা (২৫), পীং প্রমোদ বিকাশ চাকমা, সাং কাঠালতলী, বাবুপাড়া বামহাতে, তপন চাকমা (২৫), পীং গলবিন্দু চাকমা, সাং বড়াদম হাতে ও মুখে, সাধন চাকমা (২২), পীং- কৃপাচরণ চাকমা, সাং বাবুছড়া ডান পায়ে ও বাম হাতে, সুনীল কান্তি চাকমা (২২), পীং সুরামোহন চাকমা, সাং হাসিনসনপুর, কবাখালী বাম পায়ে এবং কালাচি চাকমা (২০) পীং- কুমোদ বিহারী চাকমা, সাং- কামোক্ষোছড়া, দীঘিনালা গুলিবিদ্ধ হন। মারাত্মক আহত অবস্থায় সুনীল কান্তি চাকমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং কালাচি চাকমাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৯৮৩ সালের বিশ্বাসঘাতক, জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের হাতে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শাহাদাৎ বরণের পর প্রতি বছর জুম্ম জাতি সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে এ দিনটি পালন করে আসছে। এইদিন কেবল তারাই বিরোধীতা করতে পারে যারা জাতির এই দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছিল। সময়ের তালে প্রতিরোধের মুখে প্রগতিশীল শক্তির কাছে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী চক্র পরাজিত হলেও তাদের প্রেতাত্মারা আজও ১০ নভেম্বর দিনে হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। শোকাহত সাধারণ জুম্ম জনতা বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের উত্তরসূরী চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ এর এহেন কার্যকলাপে হতবাক না হয়ে পারেনি।

মহালছড়িতে সেটেলার টাইগার বাহিনীর সদস্য ধৃত

গত ৩রা নভেম্বর ২০০১ তারিখে মহালছড়ি থানাধীন মাইসছড়ি ক্যাম্পের আর্মীরা নুনছড়ি নামক স্থানে ১০ সদস্যের একটি সশস্ত্র দলকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদের সশস্ত্র সংগঠন বাঙালী টাইগার বাহিনীর সদস্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৪টি এলজি, ৪টি পিস্তল এবং প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তি পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটেলারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে জুম্মদের উপর হামলা, জুম্মদের বসতবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, গুম, জুম্ম নারী অপহরণ ও ধর্ষণ, ভূমি বেদখল ইত্যাদি অপতৎপরতা সরকারী বাহিনীর ছত্রছায়ায় চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত চার বছরে বহিরাগত সেটেলার কর্তৃক ৬ জন জুম্ম হত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলায় ৪ জন ভিক্ষু ও ২০ জন মহিলাসহ ১১৫ জন জুম্ম জখম, ৩ জন কিশোরীসহ ১২ জন জুম্ম নারী ধর্ষিত ও ৫ জন যৌন হয়রানির শিকার, ৩ জন কিশোরীসহ ৪ জন জুম্ম নারী অপহরণ, ৩৩৫টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মিভূত, ২টি বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর এবং শত শত জুম্ম নারী-পুরুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে হয়রানি করা হয়। তাদের এই অপতৎপরতা চালানোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে গোপন অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে বলে জানা যায়। অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার লক্ষ্যে অস্ত্র আনার সময় উক্ত সশস্ত্র সেটেলাররা ধরা পড়েছে বলে সন্দেহ করা হয়।

শ্রীমতি হ্লামাচিং মারমার শ্লীলতাহানি

রাঙামাটি শহরের ভেদভেদীস্থ আনসার ক্যাম্পের পাশে কতিপয় সেটেলার দুর্বৃত্ত কর্তৃক গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে শ্রীমতি হ্লামাচিং মারমা (২৮) নামে একজন অসহায় জুম্ম নারী ধর্ষিত হয়। আনুমানিক রাত ১২টার সময়ে ভেদভেদীস্থ মোতালেব মিস্ত্রির ছেলে মোঃ খোকনের নেতৃত্বে ৫ জন সেটেলার বাঙালী হ্লামাচিং মারমা, স্বামী হ্লাচিংমং মারমা, সাং- উলুছড়া, ভেদভেদী এর বাড়ীতে হানা দেয়। এ সময় হ্লামাচিং মারমা তার ৫ বছরের ছেলে হাতু মারমা, ৩ বছরের মেয়ে চিনুচিং মারমা ও ১০ বছরের ভাগিনা ম্রাচাথোয়াই মারমা বাড়ীতে ঘুমাচ্ছিল। তার স্বামী হ্লাচিংমং মারমা গ্রামের বাড়ী সোনাইছড়িতে গিয়েছিল। দূর্বৃত্তরা তাকে ঘরে একা পেয়ে বাড়ীর টিনের দরজা লাথি মেরে ভেঙে ফেলে বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কোনরূপ চিৎকার না করা ও আলো নিভিয়ে দেবার জন্য বলে। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাড়ীর বাইরের বাতিগুলোও ভেঙে ফেলে নিভিয়ে দেয়। সঙ্গীসহ মোঃ খোকন হ্লামাচিং মারমাকে জাপটে ধরে বিছানায় নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টাকালে শ্রীমতি মারমা বাধা দেয়। এ সময় দুর্বৃত্তরা হ্লামাচিংকে একের পর এক কিল ঘুষি মারে ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এক পর্যায়ে হ্লামাচিং দুর্বল হয়ে পড়লে দুর্বৃত্তরা উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর দুর্বৃত্তরা চলে যাবার সময়

হুমকি দেয় যে, এ ঘটনাটি কাউকে জানালে তারা আবার ধর্ষণ করবে এবং পরিবারের অন্যান্যদের হত্যা করবে। দুর্বৃত্তরা শুধু ধর্ষণ করে ক্ষান্ত হয়নি, যাবার সময় বাড়ীর আসবাবপত্র, হাড়িপাতিল, কাপড়-চোপড়সহ সব মূল্যবান জিনিষপত্রও লুটপাট করে নিয়ে যায়।

হ্লামাচিং মারমার চিৎকার করলেও ১০০ গজের দূরে অবস্থিত আনসার ক্যাম্প থেকে উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। ঘটনার এক ঘন্টা পর হ্লামাচিং মারমার বাড়ীর অপর পাড়ে অবস্থিত প্রতিবেশী আতুচি মারমা, সুনির্মল চাকমা ও ঊষাই মারমা তাকে উদ্ধার করতে আসেন। বাড়ীতে এসে তারা হ্লামাচিং মারমাকে আহত অবস্থায় দেখতে পান। ধস্তাধস্তি ও কিল-ঘুষি মারার ফলে হ্লামাচিং মারমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। তারপর দিন সকালে তাকে আহত অবস্থায় রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গড়িমসির ফলে এক পর্যায়ে ধর্ষণের মেডিকেল পরীক্ষা করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচন্ড চাপের মুখে তারপর দিন অনেক দেরীতে মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়। অপরদিকে পুলিশ প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য কিছু লোক দেখানো তৎপরতা দেখালেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মোঃ খোকনসহ দুর্বৃত্তরা বর্তমানে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য শ্রীমতি হ্লামাচিং মারমা ও তা স্বামী হ্লাচিংমং মারমাকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। অন্যথায় আরো করুণ পরিণতির মুখোমুখী হতে হবে বলে দুর্বৃত্তরা শাশিয়ে যাচ্ছে।

প্রশাসনের এহেন উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততার প্রতিবাদে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শ্রীমতি হ্লামাচিং মারমার চিহ্নিত ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, হ্লামাচিং মারমাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রদান করা, জুম্ম নারীদের উপর এ যাবৎ সংঘটিত সকল ধর্ষণ ও অপহরণ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা ও ক্ষতিগ্রস্থ জুম্ম নারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং সমতল জেলাগুলো থেকে নিয়ে আসা সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করার দাবী জানিয়ে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে এক স্মারকলিপি প্রদান করে। কিন্তু দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রশাসনের উদ্যোগ ও চেষ্টা-চরিত্র আজ অবধি পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমানে হ্লামাচিং মারমা মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দিনাদিপাত করছে।

গরু বিক্রির টাকা নিতে এসে খুন হলো শুক্রচার্য চাকমা

বরকল থেকে রাঙামাটি শহরে গরু বিক্রির টাকা নিতে ও ৫ গরু ব্যবসায়ীকে পৌঁছে দিতে এসে লাশ হয়ে ঘরে ফিরলো রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের মাইচছড়ি গ্রামের বাসিন্দা শুক্রচার্য চাকমা (৪০) পীং বিজু চন্দ্র চাকমা। ১৫ ডিসেম্বর ২০০১ সন্ধ্যা ৬/৭টার দিকে ট্রলার বোটে ৫ জন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীসহ বরকল সদর থেকে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় শুক্রচার্য চাকমা। ১৬ ডিসেম্বর ভোর হলে তার লাশ পাওয়া যায় রাঙ্গামাটি শহরের পুরাতন বাসষ্টান্ডের পাশে পেট্রোল পাম্পের সংলগ্ন লেকে ভাসমান অবস্থায়। তাকে মাথায় কোপ মেরে হত্যা করা হয়েছে। ৫ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী তাকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। গরু ব্যবসায়ীরা রানীর হাট থেকে এসে প্রথমে বরকলে গিয়ে পাহাড়ীদের কাছ থেকে মোট ৫টি গরু ক্রয় করে। গরু ক্রয়-বিক্রয়ে শুক্রচার্য চাকমা মধ্যস্থতা হিসেবে কাজ করে। ব্যবসায়ীরা নগদ ৩টি গরুর দাম দিয়ে বাকী টাকা রাঙ্গামাটি এসে শুক্রচার্য চাকমার মাধ্যমে পাঠানোর কথা হয়। কিন্তু শুক্রচার্য চাকমা গরু বিক্রির বাকী নিতে এসে এক পর্যায়ে হত্যার শিকার হয়। ঐ ৫ গরু ব্যবসায়ী বকেয়া টাকা জায়েজ করার জন্য তাকে হত্যা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ৫ গরু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এ ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ১৮ ডিসেম্বর বরকলে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল আয়োজন করে। সমাবেশে ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী করেছে।

জনসংহতি সমিতির নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরার ছেলে অপহৃত

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরার ছেলে চন্দন ত্রিপুরা (কালোমণি) (১৭)কে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা মাঠ থেকে বন্দুক উচিয়ে অপহরণ করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর ২০০১ বিকেল ৩.০০ ঘটিকার দিকে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্যরা তাকে অপহরণ করে। তাকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করার পর পরে ছেড়ে দেয়া হয়। ঢাকায় কোডা বিজ্ঞান কলেজে ১ম বর্ষের ছাত্র ঈদের ছুটিতে বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল সে। খাগড়াছড়ি শহর থেকে দিন দুপুরে এহেন অপহরণের ঘটনায় এলাকাবাসী হতবাক হয়ে পড়ে। প্রকাশ্য দিবালোকে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ এর সদস্যদের সশস্ত্রভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় বলেও এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে।

বরকলের মাছছড়িতে গুন্ডুষদের গুলি বর্ষণ

বরকল থেকে রাঙামাটি ফেরার পথে বরকলের মাছছড়ি নামক স্থানে চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র ইউপিডিএফ সদস্যরা গুলি ছুঁড়ে একটি দেশীয় ট্রলার থামাতে চেষ্টা করে। অন্যান্যের মধ্যে ট্রলারের যাত্রী ছিলেন দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদদাতা হরিকিশোর চাকমা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুশোভন দেওয়ান, ডাঃ পরশ খীসা ও ডাঃ প্রীতিলেন্দু দেওয়ান। তারা নিজস্ব অর্থায়নে বরকলে দুঃস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ শেষে রাঙামাটি ফিরছিলেন। ফেরার পথে চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসীরা তাদের বোট থামাতে আর্মী চেকপোষ্ট থেকে গুলি চালায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে। তারা কোনোমতে

সেখান হতে চলে আসতে পারলেও অন্য দুটি ট্রলার সন্ত্রাসীদের গুলির মুখে তাদের পোষ্টে থামাতে বাধ্য হয়। যাত্রীদের লুটপাট আর বোট চালক থেকে মোটা অংকের চাঁদা নেওয়ার পর তারা বোট দুটিকে ছেড়ে দেয়।

বরকলে চালকসহ কাঠ বোঝাই ট্রলার অপহরণের চাঞ্চল্যকর ঘটনা

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার সুভলং থেকে চালকসহ সেগুন কাঠ বোঝাই দু'টি ট্রলার বোট অপহরণের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটেছে। গত ৭ জানুয়ারী ২০০২ রাত্রে রাঙ্গামাটি জেলার সুভলং ফরেষ্ট বিট ঘাট থেকে ফারুখ ও আবুল খায়ের নামে দু'জন চালকসহ উক্ত কাঠ বোঝাই ট্রলার দু'টি হারিয়ে যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী ও সাম্প্রদায়িক কতিপয় মহল নানা ধরনের ফায়দা লুটার চেষ্টা করতে থাকে। এ ঘটনার সাথে পাহাড়ীদের জড়িত থাকার কথা প্রচার করে রাঙ্গামাটি শহরে পাহাড়ীদের উপর হামলার নানা ধরনের ফন্দি ফিকির করতে থাকে এ মহল। এক পর্যায়ে গত ১৪ জানুয়ারী ২০০২ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে অপহৃত কাঠের ব্যবসায়ী রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজারে বসবাসরত ফজল আহম্মেদ ভান্ডারী পীং মৃত দুদু মিয়া কর্তৃক ১২ জানুয়ারী ২০০২ একযোগে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, চট্টগ্রাম সেনানিবাসের এরিয়া কম্যান্ডার, কাপ্তাই রিজিয়ন কম্যান্ডার, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কম্যান্ডার, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক ও রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপারের বরাবরে দেয়া অভিযোগনামায় জানা যায় ভিন্ন কথা। তিনি তাঁর দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে উক্ত সেগুন কাঠের ব্যবসায়ী ভান্ডারী রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার রোড পয়েন্ট নামক স্থানে গিয়ে ট্রলার দু'টিতে উক্ত সেগুন কাঠ বোঝাই করতে থাকে। কাঠ বোঝাই কালে শীলছড়ি সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কম্যান্ডারের নেতৃত্বে ১৫/১৬ জনের একদল সেনা সেখানে যায় এবং ব্যবসায়ী ভান্ডারী থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবী করে। এ সময় ব্যবসায়ী ভান্ডারী জানায় যে, সব কাঠের বৈধ কাগজপত্র তার আছে। তাই কোন টাকা দিতে পারবে না। টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় সেদিন সেনা সদস্যরা অপর এক ব্যক্তিসহ তাকে রাত ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখে। ব্যবসায়ী ভান্ডারীকে অন্তত ৫ শতাধিক বার পানিতে ডুব দিতে বাধ্য করে। পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনও করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। রাত শেষে তারপর দিন কাঠ বোঝাই ট্রলারসহ তাকে বন্দুকছড়ি সেনা জোন সদরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও সেনা জোন কম্যান্ডার ৫০ হাজার টাকা দাবী করে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং ৫০ হাজার টাকা না দিলে গাছ, বোর্ট ও মানুষ কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না বলে বলা হয়। সে সময় ব্যবসায়ী ভান্ডারী কাঠের বৈধ কাগজপত্র ও ডি ফরম প্রদর্শন করে। কিন্তু টাকা না দেওয়াতে বন্দুকছড়ি জোন কম্যান্ডারের নানা গড়িমসি করতে করতে দশদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। দশদিন পর এক পর্যায়ে সেনা কর্তৃপক্ষ কাঠ বোঝাই বোট ও বোটের চালকদের জুরাছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয়।

পরে রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনা তদন্ত করেন এবং বৈধ কাগজপত্রের প্রমাণ পেয়ে ৬ জানুয়ারী ২০০২ কাঠ বোঝাই বোট ও চালকদের ছেড়ে দেয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার পর সেদিনই রওয়ানা দিয়ে বরকল উপজেলার সুভলং ফরেষ্ট বিট ঘাটে এসে পৌছায়। ইতিমধ্যে ১৫/২০ দিন সময় অহেতুক দেরী হওয়ার ফলে কাঠের ডি ফরমের সময়-সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তাই সুভলং ফরেষ্ট বিটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিম্মায় কাঠ বোঝাই দু'টি বোট এবং দু'টি বোটে নতুন দু'জন চালক রেখে ডি ফরমের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সেদিন ব্যবসায়ী ভান্ডারী রাঙ্গামাটি চলে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ৭ জানুয়ারী রাত্রে বোটের দু'জন চালকসহ কাঠ বোঝাই বোট অপহৃত হয়ে যায়। পরে ১১ জানুয়ারী চালক ও কাঠ বিহীন অবস্থায় সুভলং ইউনিয়ন কার্যালয়ের পূর্ব দিকে চেয়ারম্যান পাড়ায় লেকে ভাসমান অবস্থায় বোট দু'টি পাওয়া যায়। বোট দু'টিতে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ৭৫৪ ঘনফুটের কাঠ ছিল বলে ব্যবসায়ী ভান্ডারী অভিযোগ করেন। তিনি দরখাস্তে প্রায় ৫/৬ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেন। এ ক্ষয়ক্ষতির জন্য বন্দুকছড়ি সেনা জোন কম্যান্ডার ও শীলছড়ি সেনা ক্যাম্প কম্যান্ডার সম্পূর্ণ দায়ী এবং চালকসহ কাঠ বোঝাই ট্রলার অপহরণের ঘটনায় সুভলং ফরেষ্ট বিটের কর্মকর্তাদের যোগসাজস রয়েছে বলে উক্ত দরখাস্তে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অপহরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন ও ক্ষতিপূরণসহ অপহৃত গাছ ও বোট চালকদের উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান।

ঐ ঘটনার সাথে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি সেনা কর্তৃপক্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেনা কর্তৃপক্ষ জানান যে, উক্ত কাঠসমূহের বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে সেনাবাহিনী সেগুলি আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে। অপরদিকে সুভলং ফরেষ্ট ঘাটে একদিকে ফরেষ্ট অফিসের প্রহরা এবং পাশেই সেনাছাউনি থাকা অবস্থায় কিভাবে কাঠ বোঝাই দু'টি ট্রলার অপহৃত হতে পারে এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ১৪/১/০২ তারিখ অপহৃত চালক দু'জনকে সুভলং সেনা ক্যাম্পের হেলিপ্যাড থেকে চোখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। অপহরণকারীরা কিভাবে সেনা ক্যাম্পের হেলি প্যাডে ছেড়ে দিতে পারলো তাও অনেকের প্রশ্ন।

এই চাঞ্চল্যকর অপহরণ ঘটনা তদন্তের জন্য রাঙ্গামাটি জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল নাসিমুল গনিকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির অপর সদস্যরা হলেন রাঙ্গামাটি রিজিয়নের ফিল্ড অফিসার, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপার, বন বিভাগের একজন প্রতিনিধি এবং উপজাতীয় জোত মালিক ও কাঠ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির একজন প্রতিনিধি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তদন্ত কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি।

কবিতাগুচ্ছ

ঝর্ণা যেমন

মংবাথোয়াই তংচঙ্গ্যা

ঝর্ণা যেমন কলকলিয়ে
পাষাণ গিরির মন ভুলিয়ে
মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে
হাজার শহর গাঁও পেরিয়ে
যায় সে ছুটে স্রোতের টানে
মনের সুখে জোয়ার বানে
কোন সাগরের হাতছানিতে
সকল বাধা তুফান ঠেলে
যায় এগিয়ে চরণ ফেলে।
আমরাও যায় তেমনি ছুটে
দৃপ্ত পদে বাঁধন ছুটে
সামনে পাহাড়- বাঁধন যতো
দুঃসাহসী বীরের মতো
তুচ্ছ করে আলোর দেশে
সুর ছড়াবো মধুর হেসে।

দুর্গম পাহাড়

মংনু মারমা

আমি যায় পাড় হয়ে যায়
দুর্গম গিরি সবুজ অরণ্য পাহাড় পথ,
ঘন ঘন ছোট ছোট বড় পাহাড়, সবুজ গাছে ভরা
যেখানে আছে জুম্মদের ছোট ছোট ঘর।
প্রাকৃতিক লীলাভূমি পাহাড়ের আড়ালে
জুম্মদের আবাসভূমি,
যে দুর্গম পাহাড়ে প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে
মিশে আছে পাহাড়ী জুমিয়াদের জীবন।
আর আমি সকাল সন্ধ্যায় শুনতে পায়
জুমিয়াদের কষ্টের গীত ধ্বনি,
সবুজ পাহাড়ের আড়ালে জুম্মদের জুমচাষ
সহজ সরল পাহাড়িদের মনে প্রাণ।
যে সবুজ অরণ্যে মারমা, মুরং, খুমী, চাকমা,
পাংখো, খিয়াং, লুসাই, বম, ত্রিপুরা, চাক
সবাই মিলে করেছে বাস,
করছে সবাই জীবন যাপন।

তোমার রক্ত বৃথা যেতে দেবনা

মংবাশৈ তংচঙ্গ্যা

তোমাকে আমরা নিতে এসেছি জুম পাহাড় হতে,
তুমি চোখ ফেরাও চেয়ে দেখ সুবেহ সাদিকের পাখী ডাকছে
স্কোয়াডের চারপাশে বউ ঠবানির লাজ রক্তের মুখ,
আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাই।
তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? ঝরে পড়া পাতার মর্মর ধ্বনি
তুমি চোখ ফেরাও চেয়ে দেখ পার্বত্য মাটি কাঁদছে।
জেগে উঠেছে কাত্তন্যা, কিষাণ, মজুর ও জুমচাষী,
আমরা তোমার রক্ত বৃথা যেতে দেব না।
বৃক্ষলতা, ধূলিকণা আর রোদে পোড়া পাহাড়ী মানুষ
তোমার আঙিনায় দাঁড়িয়ে,
সূর্যের প্রভাতী আভা ছুঁয়ে যাচ্ছে তোমার সমাধি।
তোমার অমর আত্মত্যাগ এই জুম পাহাড়ে
আমরা তোমার রক্ত বৃথা যেতে দেব না।

কাপ্তাই হ্রদ

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

সূর্য ফুরমোনের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে, ঘরে ফেরা
পাখির ঝাঁকে ঢেকে গেছে আকাশ, আমরা দু'জন -
কাপ্তাই হ্রদের অথৈ জলরাশির ঢেউ গোনার প্রতিযোগিতায়
মেতে উঠি। আমরা বারে বারে হেরে যাই ঢেউয়ের সংখ্যার
কাছে। একদা - সবাই যেমন হেরে গিয়েছিল স্বার্থান্বেষী
মহলের ষড়যন্ত্রের মন্ত্রে।

কাপ্তাই হ্রদ - সমতটের পর্যটকদের কাছে অপার সৌন্দর্যের
উপকরণ, বিদেশ থেকে আসা সৌন্দর্য পিপাসুর কাছে
"এস্মল প্যারাডাইস", আর আমাদের কাছে - বেঁচে
থাকার অবলম্বন হারানোর বেদনার এক উপাখ্যান।
কাপ্তাই হ্রদ তোমার সৌন্দর্য আমাদের হৃদয় বিমোহিত
করে না, পূর্ব পুরুষের অশ্রু মিশেছে তোমার জলরাশিতে -
লক্ষাধিক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের দীর্ঘশ্বাস কেবলই
তাড়িয়ে বেড়ায় আমাদের হৃদয়কে।

লিমেরিক

রাজনীতি কাব্য

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

আল্‌ঝ্যারাম জুম্ম, দেজ হিল চাদিগাং
এক্‌কালে তালুক এল্‌ - ইক্কিনে ফগদাং।
মাত্তল্যা মানঝ্যর পুত, - কন' কামনেই।
রেদে দিনে মদ খায়, বেগার থেই থেই।
তল আদামর বাঙাল্যা তারে ডাগি কল-
-মর সমারে রাজনীতি গল্লে, হ্‌বে ঝলমল!
আল্‌ঝ্যারামে রাজী হ্‌ল - তারে নেতা গল্লে-
বাপ্‌ভেইয়রে মারিব - বাঙাল্যা হুগুম দিলে।
হ্‌ঝি হ্‌ল বাঙাল্যা - বাহ্‌ , সাবাশ সাবাশ
জুম্মপুত্র আল্‌ঝ্যারাম - বাঙাল্যার ক্রীতদাস।

পুষ্পাঞ্জলি শহীদের স্মরণে

এ কে চাকমা শিমূল

আত্মবলিদান দিয়ে তুমি
তিরাশির ১০ই নভেম্বরকে করেছো মহান।
শিক্ষা দিয়ে গিয়েছো তুমি
করতে হবে এমনিভাবে আত্মবলিদান।
চেতনা দিয়ে জেগে তুলেছিলে
তোমারই সেই চেতনার মূলমন্ত্র দিয়ে;
জুম্ম জাতীয়তাবাদে ভালোবেসেছিলে
জুম্ম জাতিকে তোমারই মহান হৃদয় দিয়ে।

তুমি তো অগ্রদূত, তুমি তো বীর
তুমি মোদের চেতনা, মোদের গৌরব
মৃত্যু বরণে নির্ভীক ছিলে, সেইদিন হে বীর
স্মরণ করি আজ, সেই মহান ১০ই নভেম্বর
বীর বেশে হাসিমুখে দিয়েছিলে প্রাণ
সত্যি মহান তুমি হে বীর সন্তান।
হবে না কোন দিন, হবে না ম্লান;
তোমারই জীবন প্রদীপ রহিবে চির অম্লান।

স্মরণ করি আজ তোমাদের সবাই
মিশুক, অর্জুন, সৈকত, জুনি ও রিপন;
স্মরণ করি আজ তোমাদের সবাই
শুভেন্দু, স্বাগত, সৌমিত্র এবং প্রবাহণ।
ভাষা পাই না খোঁজে, জানাতে তোদের
এবং সকল শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি;
গ্রহণ করো মোদের হাজারো সালাম
গ্রহণ করো মোদের এই অকৃত্রিম পুষ্পাঞ্জলি।

আহ্বান

সুভাষ বসু চাকমা

ওরে জুম্ম জাতির নবজোয়ান .....
গাও সবে সমস্বরে সামনে চলার গান,
লয়ে দৃপ্ত শপথ-
বীর কদমে সমতালে হও আগুয়ান,
করতে পরাধীন জুম্ম জাতির মুক্তির সন্ধান।

তোদের শক্তি, তোদের বল,
তোদের সাহস করিয়া সম্বল,
মুক্তির অন্বেষায় জুম্ম জনতার সাহচর্যে
চলরে সামনে এগিয়ে চল-
কাস্তে হাতুড়ি অস্ত্র শাবল, তার চেয়ে
বড় হোক তোদের মনোবল।

মুক্তির দ্বারে থাকুক যতই লৌহ কপাট
দৃঢ় মনোবলে করো সজোরে আঘাত
ভেঙ্গে করো চুরমার .....
খোল খোল মুক্তির দ্বার,
ওরে নতুন প্রাণে তেজীয়ান নব জোয়ান
তোরা অদম্য অসীম শক্তির আধাঁর।

হে যুযুধান, নব জোয়ান .....
কোথা হে মুক্তির দ্বার?
হয় যদি বা জীবনের ওপাড়,
তবু রক্ত নদী পারি দিয়ে
খুঁজিতে হবে রে তোদের - সেই পাড়।

আর হয় যদি বা ছিড়ে রাতের আঁধার
ঊষার আকাশে মুক্তির দ্বার - স্বাধিকার,
তবু হে, জাতির শৌর্য, বীর্য,
আকাশ হতে ছিনিয়া আনো স্বাধিকার সূর্য,
করো হে প্রতিষ্ঠা স্বভূমে স্বশাসন।
ওরে নতুন আশার আলো নব জোয়ান .....
শোন হে জুম্ম জাতির এই উষ্ণ আহ্বান।

মাগো বলে

মনায়ন চাকমা

কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা
ভেঙ্গে গেছে সাজানো সংসার
উড়ে গেছে প্রাণটা!!
আমি আর ডালের বুড়ি শুকিয়ে গেছি
কল্পনা তুই কবে আসবি
আমাকে তুই কবে মা বলে ডাকবি?
মাগো বলে তোমার মত,
সবাইকে আর কেড়ে নেবে না তো
আমার কোল থেকে
গল্প শুনতে দেবে না ওরা!!
না তা হবে না মা
যেতে হচ্ছে না আর নিঃস্ব জীবন নিয়ে
আমরা নেমেছি মা নেমেছি রাজপথে
জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে!!
তোমায় ছেড়ে এবার নেমেছি আমরা
নেমেছি রাজপথে, আর হতে দেবো না মা
কল্পনার মতো অপহরণ হতে!!
ভয় পেয়ো না মা
আমরা আছি তোমার পাশে!!
এসো হে নবীন নবীনা
এসো হে কিশোর কিশোরী
এসো হে যুবক যুবতী!!
এসো হে পার্বত্য চট্টলার এগার জুম্ম জাতি।
পার্বত্য চট্টলার এগার জুম্ম জাতি
আমরা নেমে পড়ি রাজপথে
জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে!!
কেঁদোনা মা তুমি!
আন্দোলনে নেমেছি
শহীদ যদি হই কোনদিন
বেঁচে থাকবে নাম
জুম্মদের মাঝে চিরদিন।

ইউপিডিএফ নামধারী সন্ত্রাসী চক্রের গুলিতে ২৩ ডিসেম্বর ২০০১ নৃশংসভাবে নিহত
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক
শহীদ দেব বিকাশ চাকমা (সুবীর ওস্তাদ)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ১৫.০০ টাকা মাত্র।

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)

Issue no. 27, 10th Year, January 2002.

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. E-mail: pcjss@hotmail.com.

Price: TK. 15.00 only.